প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

জুলাই ২০২১

ঈদ-উল-আযহা সংখ্যা

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৭

জুলাই ২০২১ ॥ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৮ ॥ জিলকদ-জিলহজ্ব ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

সম্পাদকীয়

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা

বিশ্ব মুসলিমের দু'টি উৎসবের অন্যতম পবিত্র ঈদ-উল-আযহা। মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়ার মধ্যে রয়েছে এর মূল শিক্ষা। আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করতে আমাদেরকে সকল সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধির মধ্যে রয়েছে ইহ ও পরকালীন জীবনে মুক্তির পথ। আনন্দ উৎসব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি বিশেষ নিয়ামত। এই উৎসব পালন করতে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসের অধ্যায়গুলোকে জানা এবং হৃদয়াঙ্গম করাও এর অন্যতম শিক্ষা। এবার এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা পালন করছি পবিত্র ঈদ উল আযহা। বৈশ্বিক মহামারী করোনার ছোবলে আক্রান্ত আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিও। মহামারী করোনার বিধি নিষেধগুলো সঠিকভাবে মেনে প্রত্যেকে ঈদ-উল-আযহা পালন করবেন এ প্রত্যাশা রাখি। ঈদ-উল-আযহা'র আগে পবিত্র হজ্জও এবার সীমিত পরিসরে পালন করা হচ্ছে। সৌদি আরব ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন দেশ থেকে কোন মুসল্লির পক্ষে এবারও হজ্জে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। করোনা মহামারীর কারণে সৌদি সরকার এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা মুনাজাত জানাই, যাতে করোনা মহামারীর অবসান ঘটে এবং সারাবিশ্বের মুসল্লিবৃন্দ আল্লাহর পবিত্র বায়তুল্লাহ ও মহানবী (সা)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ঈদ এর আভিধানিক অর্থ খুশি। পবিত্র ঈদ উল আযহা'র অন্যতম অঙ্গ পশু কুরবানি করা। এই পশু কুরবানির অন্যতম উদ্দেশ্য মনের পশুত্ব কুরবানি করাও। আমরা যদি সফলভাবে আমাদের জীবনের পশুত্বগুলোকে কুরবানি করতে পারি তাহলে এই উৎসবের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেও হাসিল করতে পারবো। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন।

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ইসলামের খেদমতে বর্তমান সরকারের অনন্য নজীর ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গত ১০ জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন। এ শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহ প্রবেশ করলো এক নতুন যুগে, নতুন ইতিহাসে। ০৫ এপ্রিল ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৯টি স্থানে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ৫০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করলো। মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের একটি বিশেষ লেখা আমরা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছি। লেখাটির মধ্য দিয়ে পাঠকেরা ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ সর্বাত্মকভাবে সফল হোক– মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা এই মুনাজাত জানাই। আমীন।

বাঙালি মুসলিম প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখকদের অন্যতম ছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর পাণ্ডিত্য, গবেষণা নিয়ে লেখালেখি হলেও তার লেখা গল্প নিয়ে একেবারে হয় না। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দু'টো জুলাই মাসে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র স্মরণে তাঁর কর্ম ও গল্পগ্রন্থ নিয়ে দুটি বিশেষ লেখা আমরা এ সংখ্যায় প্রকাশ করলাম। পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে অগ্রপথিক-এর এই সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে ও বিশেষ আয়োজনে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রত্যাশা করি সংখ্যাটি পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করবে।♦

সূচি

মডেল মসজিদ

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ : একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ♦০৯

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ড. আবদুল জলীল

কুরবানী : তত্ত্ব ও ইতিহাস♦১৫

মুফতী মো. আবদুল্লাহ

কুরবানী : ফাযায়েল মাসাইল♦২০

মুস্তাফা মাসুদ

প্রসঙ্গ কোভিড-১৯ :
মহানবী (সা)-এর আপৎকালীন নির্দেশনা♦৪১

ইমাম

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী♦৫০

মুজিববর্ষ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান/
গুলশান আকতার

মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা♦৬৩

গোলাম মোহম্মদ আইয়ুব খান

জাতির পিতা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়♦৭৪

রোকেয়া আক্তার

বঙ্গবন্ধু চর্চা : নতুন প্রজন্মের জন্য জরুরি♦৭৮

স্মরণ

এম আবদুল আলীম

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ :
খাঁটি বাঙালি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান♦৮৫

কবিতা

খালেক বিন জয়েনউদদীন
আঁধারের সিঁড়ি ভেঙে♦৯১
হাসান হাফিজ
জন্মের ভিতর শব্দ♦৯২
সেলিম মাহমুদ
পানি প্রবাহের মেকানিক্স♦৯৩
তাহমিনা কোরাইশী
বিজয়♦৯৪
আনোয়ার কবির
জন্ম পূর্নজন্মের মধ্যে বয়ে চলা♦৯৫
তোফায়েল তোফাজ্জল
লেজ যতই মোটার দিকে♦৯৬
সমীর আহমেদ
মুখ খুঁজি♦৯৭
মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর
শেষ কথা♦৯৮
আখতারুল ইসলাম
একজন শেখ মুজিবুর♦৯৯
মুহা. আরফান আলী ফুলপুরী
যার হুকুমে সব কিছু হয়♦১০০

অনুবাদ গল্প

মূল : মেহমেদ নুসরাত নেসিন (আজিজ নেসিন)
অনুবাদ : কাজী আখতারউদ্দিন
আপনাদের দেশে কি কোন গাধা নেই? ♦১০১

গল্প

জব্বার আল নাঈম
দাদন আলীর চুরিবিদ্যা ও জীবনের কলকব্জা♦১১৬

সাহিত্য

মুহাম্মদ ফরিদ হাসান
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্প♦১৩০
গাজী সাইফুল ইসলাম
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চিলিয়ান
কবি পাবলো নেরুদার কবিতা♦১৩৭

নিরাপত্তা

মো. উবাইদুল্লাহ
বজ্রপাতে নিরাপত্তা বিষয়ক উপায়সমূহ♦১৫১

পরশমণি

আল-কুরআন

১। বল 'আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে'। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলমান। *(আনআম : ১৬২-১৬৩)*

২। কখনো আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের (পশু) গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদের। অবশ্যই আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে, তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না। *(সূরা হাজ্জ : ৩৭-৩৮)*

৩। নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। *(সূরা কাওছার : ১-৩)*

৪। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হতে বের করেছি তার অংশ ব্যয় কর। *(সূরা বাকারা : ২৬৭)*

৫। স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি কাবাঘরকে মানবজাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। *(বাকারা : ১২৫)*

আল-হাদীস

১। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কুরবানীর দিন বনি আদমের কোন আমলই এত অধিক প্রিয় নয়, যতটা প্রিয় কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। কুরবানীর জন্তুগুলোর শিং, পশম ও খুরসহ কিয়ামতের দিন নেকির পাল্লায় রাখা হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দচিত্তে কুরবানী করবে। *(তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)*

২। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় সাহাবী প্রিয় নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুরবানী কি? প্রিয় নবী (সা) বললেন, তোমাদের (জাতির) পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সুন্নাত। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, এতে আমাদের জন্য কি আছে? রাসূলে পাক (সা) বললেন, কুরবানীর গরু ও বকরীর প্রতিটি পশমে নেকি রয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে ভেড়া ও দুম্বার পশমের ছওয়াবও আছে?। *(আহমাদ ইবনে মাযাহ, মিশকাত-পৃ. ১২৯)*

৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান কুরবানীর দিন যে সব নেকির কাজ করে থাকে তারমধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো কুরবানী করা। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু তার শিং পশম ও খুরসহ উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই উহা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব, তোমরা এ পুরস্কারে আন্তরিকভাবে খুশি হও। *(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, মিশকাত-পৃ-১২৮)*

৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ : একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

গত ১০ জুন ছিল বাংলাদেশসহ মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী দিন। এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ২২ মার্চ ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। সারাবিশ্বে বর্তমানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ইসলামের প্রচার- প্রসার ও খেদমতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সবচেয়ে বড় ও সফল একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ জারি এবং পরবর্তীতে ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন প্রণয়ন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান ইসলামের খেদমতের জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, দীর্ঘ ৪৩ বছর পর ২০১৭ সালে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন পূরণে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মডেল মসজিদ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে ছড়িয়ে দিলেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

গণভবনে ৫৬০টি মডেল মসজিদের ৫০টির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণের প্রেক্ষাপট

বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারেও প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। গত ০৮-০২-২০১৫ খ্রি. তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক গত ২৫-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি সামগ্রিকভাবে সৌদি সরকারের অর্থায়নে (সম্ভাব্য) বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সৌদি সরকার কর্তৃক অর্থায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে গত ২৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি (১ম সংশোধিত) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৮৭২২.০০ কোটি টাকা (আট হাজার সাতশত বাইশ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। গত ০৫-

০৪-২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৯টি স্থানে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নে একই সাথে এতগুলো মসজিদ নির্মাণের এই মহতী উদ্যোগ জাতীয় ইতিহাসে শুধু নয় মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মুসলিম বিশ্বের কোন দেশের মুসলিম শাসক বা সরকার প্রধান একসাথে ৫৬০টি মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মর্মে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অসাধারণ উদ্যোগ ইতিহাসের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বিশাল কীর্তির কথা যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে।

জেলা ও উপজেলায় মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্য

মসজিদ নির্মাণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত বরকতময় কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাউস টিপে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিনদের যে সমস্ত আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও কবরে চলমান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো নির্মাণকৃত মসজিদ। (মুসনাদ)

মহান আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয় মসজিদের মাধ্যমে। মসজিদের গুরুত্ব অনুধাবন করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় হিজরতের পর প্রথমেই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। এছাড়া আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক গঠনে এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কুরআন ও নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে আগামী দিনের নাগরিক– শিশু কিশোরদের গড়ে তুলতে পারলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রাপ্তবয়স্ক জনগণকে ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্মিত এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সভা, কর্মশালা, ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের ব্যবস্থাও থাকবে। এখানে লাইব্রেরি, গবেষণাসহ ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা, প্রচার ও বিকাশের নানামুখী ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে একটি অনাচার ও দুর্নীতিমুক্ত শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মসজিদের খতিব ও ইমামগণের মাধ্যমে প্রতি বছর অপরাধ. দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি ও নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন অনাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারের এতদসংশ্লিষ্ট নীতি জনগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবহিত করার জন্য অসংখ্য বয়ান ও খুতবা দানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

৫৬০টি মডেল মসজিদে যেসকল সুবিধা থাকছে

- নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক অযু ও নামায আদায়ের ব্যবস্থা
- প্রতিটি মসজিদে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- হজ্জ প্রশিক্ষণ ও হজ্জযাত্রীদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা
- ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- গবেষণা কেন্দ্র ও ইসলামী লাইব্রেরি
- অটিজম কর্ণার
- মৃতদেহ গোসল ও জানাযার ব্যবস্থা
- গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা
- হিফজখানার ব্যবস্থা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, সহজ কুরআন শিক্ষা এবং গণশিক্ষা কেন্দ্র
- ইসলামি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাকক্ষ
- ইসলামি বই বিক্রয় কেন্দ্র
- দেশী-বিদেশী মেহমানদের জন্য 'অতিথিশালা' বা আবাসনের ব্যবস্থা
- সময়ের চাহিদা মোতাবেক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ
- ১৯,৯০,০৩৬ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৫৬০টি ভবন নির্মাণ;
- ৪,৪০,৪৪০ জন পুরুষ এবং ৩১,৪০০ জন মহিলার নামায পড়ার সুবিধা;
- পবিত্র কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত ৩৪,০০০ জন পাঠকের জন্য লাইব্রেরিতে পাঠ সুবিধা;
- প্রতিদিন ৬,৮০০ জন গবেষকের গবেষণা করার সুবিধা;
- দৈনিক ৫৬,০০০ জন মুসল্লির দ্বীনি দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধাদি;
- প্রতি বছর ১৪,০০০ জন শিক্ষার্থীর কুরআন হেফজ করার সুবিধাদি;
- প্রতি বছর ১৬,৮০০ জন শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা;
- ২,২৪০ জন অতিথির আবাসনের সুবিধা;
- প্রতি বছর বাংলাদেশের মোট হজ্জ যাত্রীর ৫০% এর ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করার সুবিধাদি;

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার ফলস্বরূপ দক্ষ, উন্নত ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ সমাজ গঠিত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনসহ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এক কথায় বলা যায়, মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী অর্জনের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নয়নে সারাবিশ্বকে মডেল হিসেবে পথ দেখাবে ইনশাল্লাহ।♦

লেখক : অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মহাপরিচালক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭

৫০ টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০ জুন ২০২১ খ্রি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর শুভ উদ্বোধন করেন

উদ্বোধনকৃত খুলনা জেলার জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

উদ্বোধনকৃত বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

মডেল মসজিদে যা যা সুবিধা থাকছে

- নারী ও পুরুষদের পৃথক ও ওযু ও নামায আদায়ের ব্যবস্থা।
- ইসলামী বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রন্থাগার, গবেষণা ও দ্বীনি দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্মেলন কক্ষ ও গবেষণা কেন্দ্র।
- পবিত্র হাফেজখানা ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা।
- বিদেশী পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থা, অতিথিশালা, মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা, হজ্জযাত্রীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ, অটিজম কর্নার ও ইমামদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- ইমাম মুয়াজ্জিনের আবাসনসহ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অফিসের ব্যবস্থা।

প্রকল্পের অগ্রগতি

নির্মাণ কাজ শেষ করে ৫০টি মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫১০টির মধ্যে ১০টির ৪র্থ তলা, ৯৯টির ৩য় তলা, ৩০টির ২য় তলা, ৩২টির ১ম তলা ও ৩৫টির নীচ তলার কলাম, ৩২টির গ্রেডবীম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য মসজিদের বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।

৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

কুরবানী
তত্ত্ব ও ইতিহাস

ড. আবদুল জলীল

ভূমিকা

কুরবানী শব্দটি বাংলায় বহুল প্রচলিত হলেও এটি মূলত আরবী শব্দ। আরবীতে কুরবান শব্দটি কাফ-রা-বা সমন্বয়ে গঠিত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ যে বস্তু কারো নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর শরীআতের পরিভাষায় ঐ বস্তু বা জন্তু যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে

সমর্পণ করা হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর সময় থেকে এর প্রচলন শুরু হয় এবং যুগে যুগে এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এ কুরবানীর প্রচলন আমরা দেখতে পাই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। বিশ্বের বুকে আগত সর্বপ্রথম মানব-মানবী ছিলেন হযরত আদম (আ) এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ)। তাঁদের থেকেই পরবর্তী প্রজন্মের যাত্রা শুরু হয়।

প্রথম কুরবানী

আল-কুরআনুল কারীমে আমরা সর্বপ্রথম তাদের দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের কুরবানীর উল্লেখ দেখতে পাই। যেমন ইরশাদ হয়েছে, "আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না। সে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করবই। অন্যজন বলল, 'আল্লাহতো একমাত্র মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোযখবাসী হও-এটাই আমি চাই এবং এটা জালিমদের কর্মফল অতঃপর তার নফস ভাই হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন যে তার ভাইয়ের শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, 'হায়! আমি কি এই কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করতে পারি; অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো। (সূরা আল মায়িদা : ২৭-৩১)

হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হতো। একজন পুত্র আর একজন কন্যা এই যমজ ভাই-বোন ছাড়া হযরত আদম (আ)-এর আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পরে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করে দিলেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে তারা পরস্পর সহোদর ভাই বোন বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে কিন্তু পরবর্তী গর্ভে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য আগের গর্ভে জন্মগ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা বোন বলে গণ্য হবে না। তাদের পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে। ঘটনাচক্রে কাবীলের সহোদরা পরমা সুন্দরী এবং হাবীলের সহোদরা বোনটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবীলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবীলের ভাগে পড়ল। এতে কাবীল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবীলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল যে, আমার সহজাত

বোনকেই আমার সাথে বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু পিতা হযরত আদম (আ) শরীআতের বিধান অনুযায়ী কাবীলের এ আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তাদের মনতুষ্টির জন্য এবং উভয়ের বিভেদ দূর করার জন্য বললেন, তোমরা উভয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কুরবানী পেশ করো। যার কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হবে সে উক্ত সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করবে। হযরত আদম (আ) নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী যে সত্য পথে আছে তার কুরবানী কবুল হবে।

তৎকালীন কুরবানী পদ্ধতি

সেকালের নিয়ম ছিল যে, কুরবানীর বস্তু বা জন্তু পাহাড়ের পাদদেশে রেখে আসা হতো। তা আল্লাহর দরবারে কবুল হলে আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে তা ভস্মিভূত করে আবার তা অন্তর্হিত হয়ে যেত। আর যে কুরবানী কবুল হতো না তা অমনি পড়ে থাকতো। এতে বুঝা যেত, উক্ত কুরবানী প্রত্যাখ্যান হয়েছে। তবে তা ফেরৎ নিয়ে এসে ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না। হাবীল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি কুরবানী হিসেবে পেশ করল এবং তা পাহাড়ের পাদদেশে রেখে আসল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবীলের কুরবানীর জন্তুটি ভস্মীভূত করে দিল। কিন্তু কাবীলের কুরবানীর বস্তু যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল, বুঝা গেল হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছে। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। ফলে আত্মসম্ভরণ করতে না পেরে প্রকাশ্যেই সে বলে ফেলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। আর বাস্তবে সে স্বীয় ভাইকে হত্যা করে বসল, যা ছিল পৃথিবীর বুকে প্রথম হত্যাকাণ্ড।

পরবর্তীকালে ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানী

কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানীর ঘটনা অত্যন্ত সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। ইহুদী, খৃস্টান মুসলিম সব ধর্মালম্বীর বিশ্বাস মতে তিনি ছিলেন অনেক উঁচু স্তরের পয়গাম্বর। আরবের মুশরিক পৌত্তলিকগণ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি ব্যাবিলন তথা বর্তমান ইরাকের উর নামক শহরে আনুমানিক খৃ. ২১৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরিপূর্ণরূপে দীন পালন এবং তা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মিসর জর্ডান হয়ে প্যালেস্টাইন চলে যান এবং সেখানেই খৃ. পূর্ব ১৯৮৫ সালে ইনতিকাল করেন। তাকে আল্লাহ বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করেন এবং সবগুলিতেই তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন আর সেগুলি সে পূর্ণ করেছিল" (সূরা আল বাকারা, ১২৪) উক্ত পরীক্ষা গুলোর মধ্যে বাদশাহ

নমরূদ কর্তৃক আগুনে নিক্ষেপ, দেশ ছেড়ে হিজরত এবং পুত্র কুরবানী উল্লেখযোগ্য।

পুত্র কুরবানীর বিবরণ হলো দীর্ঘকাল যাবত তার কোন সন্তান হতো না কারণ স্ত্রী সারা (আ) ছিলেন বন্ধ্যা। মিসর হিজরতকালে মিসরের বাদশাহ কর্তৃক স্বীয় কন্যা হাজেরা (আ)-কে তাদের খেদমতে প্রদান করায় সারা (আ) নিজে উদ্যোগী হয়ে হাজেরা (আ)-কে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে বিবাহ দেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ)-এর ৮৬ বছর বয়সের সময় হাজেরা (আ)-এর গর্ভে তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে শিশুপুত্র ও তার মাকে মক্কায় যথাযথ কূপের নিকট রেখে আসেন। মাঝে মধ্যে ইবরাহীম (আ) তাদের দেখাশুনার জন্য সেখানে গমন করতেন। পুত্র ইসমাঈল (আ) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করতে শিখেছে, মুফাসসিরদের এক বর্ণনামতে তার বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি স্বীয় পুত্রকে জবেহ করছেন। এরপর তিন রাত তিনি এ স্বপ্ন দেখেন। এতে তিনি বুঝে নিলেন যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার একমাত্র পুত্রকে কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কারণ নবীদের স্বপ্নও ওহী। সুতরাং এ আদেশ বাস্তবায়নের জন্য তিনি পূর্ণরূপে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আর পুত্রকেও পূর্ব থেকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য স্বপ্নের বিষয়টি তাকে অবহিত করে বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি বলো। তিনিও তো ইবরাহীম খলীল (আ)-এর পুত্র। তাই কোনরূপ ভয় দ্বিধা ও সংকোচ না করেই সোজা বলে দিলেন হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। পুত্রের এহেন মনোবল দেখে তিনি খুশী হলেন এবং পুত্রকে যবেহ করার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এবং খোলা মরুভূমিতে নিয়ে তাকে বালুর উপর কাৎ করে শোয়ায়ে দিলেন। এভাবে পিতা-পুত্র উভয়ে যখন মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন এবং ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর গলায় সজোরে ছুরি চালিয়ে দিলেন তখন মহান আল্লাহ তাকে ডেকে বললেন হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নদেশ সত্যই পালন করলে। কারণ স্বপ্ন ছিল যবেহরত অবস্থায় দেখা। আর তা সম্পন্ন হয়েছে। তাই এ পরীক্ষায়ও তিনি সফল হলেন। মহান আল্লাহ এর সত্যায়ন করে বললেন, এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে (সূরা সাফফাত: ১০৫-১০৭)। সেটি ছিল বেহেশত থেকে প্রেরিত একটি দুম্বা। মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী এ আওয়াজ শুনে হযরত ইবরাহীম (আ) উপরের দিকে তাকালে হযরত

জিবরাঈল (আ)-কে একটি ভেড়া নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে অতঃপর উক্ত ভেড়াটি যবেহ-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানী সম্পন্ন হয়। এটা যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং এ কুরবানী কবুল হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই সেহেতু আল্লাহ একে মহান কুরবানী বলে অভিহিত করেন। দীর্ঘকাল যাবত উক্ত ভেড়ার শিং কাবা শরীফের ভিতরে সংরক্ষিত ছিল। সেই থেকে এখন পর্যন্ত পশু কুরবানীর ধারা অব্যাহত রয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর কুরবানী: আখেরী নবী হযরত রাসূলে কারীম (সা) এহেন ত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়ে পিছিয়ে থাকেননি। দশম হিজরী বিদায় হজ্জের সময় তিনি মহান আল্লাহর দরবারে একশটি উট কুরবানী হিসেবে পেশ করেন। তন্মধ্যে ৬৩টি উট তিনি নিজ হাতেই যবেহ করেন। আর বাকী ৩৭টি উট যবেহ করার জন্য হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন। সাথে সাথে তিনি সমস্ত গোশত চামড়া সবকিছুই সাদাকা করার নির্দেশ দেন।

পূর্ববর্তী উম্মতের কুরবানী এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর কুরবানী মধ্যে পার্থক্য: কুরবানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ত্যাগের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী উম্মতের মধ্যে যেন তারতম্য নেই। তবে হযরত আদম (আ)-এর সময়কাল থেকে শুরু করে হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর পূর্ব পর্যন্ত কোন উম্মতের জন্যই কুরবানী হিসেবে পেশ করার পর তার দ্বারা উপকার লাভ করা বা তা ভোগ করার কোনরূপ অনুমতি ছিল না। কারণ তা তো সত্ত্ব ত্যাগ করে আল্লাহকেই সোপর্দ করা হয়েছে। একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় এহসান বশত তার মালিকানায় পেশকৃত কুরবানীর জন্তু বা বস্তু ভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। ফলে এ উম্মতের কুরবানীর ছওয়াব ও লাভ হচ্ছে সাথে সাথে তারা তা ভোগও করতে পারছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছেন "অতঃপর তোমরা তা (কুরবানী পশু) থেকে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও"। (সূরা হাজ্জ, ২৮)

যুগে যুগে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা নবী রাসূলগণ তারই দেয়া সম্পদ থেকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরবানী দিয়েছেন। আর রেখে গেছেন আমাদের জন্য সে অনুকরণীয় আদর্শ। তাই আমাদেরও উচিত, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারই দেয়া সম্পদ থেকে যথাসাধ্য কুরবানী দেয়া। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন। তিনিই উত্তম তাওফীকদাতা।♦

কুরবানী : ফাযায়েল মাসাইল

মুফতী মো. আবদুল্লাহ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী করা বিধিবদ্ধ করেছেন; যেন তারা তাঁরই প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহর নামে কুরবানী করতে পারে। তাঁর প্রিয় হাবীব (সা)-এর প্রতি, তাঁর আল-আসহাব ও আহলে-বায়ত-এর প্রতি অগণিত দুরূদ ও সালাম, যাঁর মাধ্যমে এ কুরবানী করার মাহাত্ম, আদর্শ, বিধি-বিধান, কল্যাণ, পন্থা-পদ্ধতি শেখার, আমল করার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি।

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ভোগের মানসিকতা পরিহার করে ত্যাগের মহিমায় অভ্যস্থ হওয়ার জন্য এটি একটি শিক্ষামূলক ইবাদত। স্বভাবগতভাবে আমরা সব সময় নিজের ভোগ-বিলাসের চিন্তায় মগ্ন থাকি। যেকারণে ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়ত অন্যতম একটি আমল হিসাবে 'কুরবানী'র বিধান বিধিবদ্ধ করেছে। পশু জবাই এর মাধ্যমে একদিকে আমরা আমাদের সম্পদ তাঁর রাহে ব্যয় করার এবং অপরদিকে আমাদের সত্তার মাঝে লুকিয়ে থাকা পাশবিকতা, দোষ-ত্রুটি, পশু-প্রবৃত্তি বিসর্জন দিতে শিখবো; তাতেই আমাদের কুরবানী সফল ও স্বার্থক হবে।

এ লেখাটিতে আমরা চার অংশে আলোকপাত করবো : এক. করোনা ও কুরবানী, দুই. কুরবানী : ফাযায়েল, তিন. কুরবানী : নিয়ম ও মাসায়েল ও চার. গোশত বন্টন প্রশ্নে উদ্ভূত কিছু সমস্যা ও তার সমাধান।

এক. করোনা ও কুরবানী

গত ২০২০খ্রি. শুরুতে করোনা মহামারী শুরু হয়ে মাহে রমযানের ঈদুল-ফিতর পেরিয়ে কুরবানীর দিনগুলো কাছাকাছি হওয়ার পূর্ব থেকেই– কয়েকদিন ধরে আলেম ও গর-আলেমসহ বেশ কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ করোনা মহামারির এ পরিস্থিতিতে, 'এ বছর কুরবানী না করলে হয় না'?– মর্মে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ বর্তমান পরিস্থিতিতে কুরবানী করার প্রশ্নে অর্থাৎ না-করার পক্ষে নেতিবাচক অনেক যুক্তি, ওযর-আপত্তি ও তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোটেও ত্রুটি করেননি। যে-কারণে মনে হল, এমন দৃষ্টিভঙ্গি তো আরও অনেকেরও হয়ে থাকবে! তাই, ভুল বুঝাবুঝি দূরিকরণার্থে, লেখাটি প্রস্তুত করার এ প্রয়াস।

কুরবানী একটি ওয়াজিব আমল। করোনা'র ভয়ে বা তেমন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে কুরবানী করা বাদ দেয়া যাবে না। যেমন কারও সন্দেহ জাগলো যে, 'কুরবানী'র জন্য যে-পশুটি ক্রয় করবো, তা-ও যদি করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে?' অথবা 'আমি যদি কুরবানী'র জন্তুটি ক্রয়ে বাজারে যাই, আর আমাকেও যদি করোনা রোগে পেয়ে বসে?' অথবা 'যাদের দ্বারা কুরবানী'র জন্তুটি কাটা-ছেঁড়া করাবো, তাদের কেউ যদি করোনা রোগে আক্রান্ত রোগী হয়ে থাকে; তবে তো আমাদেরও করোনা হতে পারে!'– ইত্যাদি সন্দেহ বা শঙ্কা বা আশঙ্কা'র কারণে

কুরবানী'র ওয়াজিব আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না; কিংবা কুরবানী রহিত বা মাফ হয়ে যাবে না। তবে হ্যাঁ, অপরাপর কাজ, হাট-বাজার বা অফিস-আদালত আমরা যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে সম্পন্ন করে থাকি; স্বাস্থ্য-বিধি ও সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখি– সেভাবেই আমাদের কুরাবানীসহ সবকিছুই করে যেতে হবে। তার কারণ:

১। 'শরীয়া আইন' ও 'আইন গবেষণা'র নীতি-মূলনীতি' সামনে রেখে যেসব বিবেচনায় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, হালাল-হারাম ইত্যাদি করা বা না করা বা ওযর-সমস্যায় ছাড় দেয়া হয়– এর সবকিছুই সেই রাসূল (সা), সাহাবাগণ ও গবেষক ইমামদের সময় থেকেই নির্ধারিত ও পূর্ব-স্থিরীকৃত হয়ে আছে। সুতরাং শরীয়তের কোন বিষয়-ব্যাপারই নিজেদের মন মত করে কিছু বলার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফাতাওয়া দেবার সুযোগ ইসলাম ধর্মে নেই। তাই, শরীয়তের সেসব তথ্য-উপাত্ত ও বিধি-বিধানের নিরীখে, কেবল 'শঙ্কা বা আশঙ্কা বা সংশয়' বা 'ধারণা' বা 'সন্দেহ-সংশয়' এর কোন মূল্য নেই। কেননা, তেমন শঙ্কা, সংশয় ও সন্দেহ তো জাগতিক সর্বক্ষেত্রেও হয়ে থাকে বা থাকতে পারে। যেমন মনে করুন! আপনি রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তো শঙ্কা জাগতে পারে যে, 'পার্শ্ববর্তী দেয়ালটি না আবার ভেঙ্গে আমার মাথার ওপর পড়ে যায়!' রেল-বাস-লঞ্চ বা বিমানে চড়তে গিয়ে সংশয় বা সন্দেহ জাগলো, 'আরে! বাস-বিমান আবার দুর্ঘটনা কবলিত হয় কি না?' অথবা 'লঞ্চটি আবার ডুবে যায় কি না!'– সন্দেহের কারণে কি আমরা এসব জাগতিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেই? কক্ষণও না।

২। অবশ্য শরীয়তে 'প্রবল সন্দেহ বা শঙ্কা'র মূল্যায়ন আছে। অর্থাৎ যা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে বা পাওয়া যাচ্ছে বা ঘটে যাচ্ছে এবং তার 'আলামত-নিদর্শন-সংকেত' বিদ্যমান। যেমন কিনা 'পরিস্থিতি বিপদ-সঙ্কুল' বা 'আবহাওয়া মারাত্মক খারাপ' মর্মে সংশ্লিষ্ট সূত্র ও বিভাগ থেকে বলা হচ্ছে– সেক্ষেত্রে আপাতত লঞ্চ ছাড়বে না এবং বিমান উড্ডয়ন করবে না। তেমন পরিস্থিতিতে বরং বিকল্প চিন্তা করা হবে, আপাতত যাত্রা স্থগিত করা হবে; কিন্তু প্রয়োজনীয় যাত্রা বা সফর একেবারে বাদ দেয়া হবে না।

অর্থাৎ কেবল সাধারণ ও স্বাভাবিক সন্দেহ-সংশয় এর কারণে, প্রয়োজনীয় কাজ, যাতায়াত, বা ইবাদত ইত্যাদি বাদ দেয়া যাবে না। এমনকি 'প্রবল সন্দেহ-আশঙ্কা'র ক্ষেত্রেও তা পরিহার করা যাবে না। একইভাবে কুরবানী'র পশুটি যদি অসুস্থ মর্মে দেখা যাচ্ছে বা তেমন কোন রোগের আলামত পাওয়া যাচ্ছে; কিংবা যারা কাটা-ছেঁড়া করতে এসেছে তাদের কারও আলামত-সংকেত দেখা যাচ্ছে, যেমন প্রচণ্ড হাঁচি-কাশি বা জ্বর– সেক্ষেত্রে তেমন কাউকে মজদুর হিসাবেও নেয়া

যাবে না; কাজে লাগানো হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে 'কেবল সন্দেহ' নয় বরং 'প্রবল সন্দেহ' ও সম্ভাবনা বিদ্যমান; তাই শরীয়তেও তার মূল্যায়ন আছে। যে-কারণে দেখে-শুনে ও সতর্কতা রক্ষা করে কুরবানী করতে হবে; কিন্তু একেবারে বাদ দেয়া যাবে না; যেমন কিনা অপরাপর কর্মকাণ্ড বাদ দেয়া হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, শরীয়তের উক্ত বিবেচনা ও মূল্যায়নকে সামনে রেখেই দেশের বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণ আলোচ্য 'করোনা' এর প্রারম্ভিক কালে নামায-জামাত-জুমু'আ ইত্যাদি একেবারে বাদ বা বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করেননি; বরং সাবধানতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন করে সম্পাদন করতে বলেছেন মাত্র।

৩। আরেকটি 'পরিস্থিতি বা অবস্থা' এমন যা 'নিশ্চিত' ও 'অবশ্যম্ভাবী'। অর্থাৎ 'নিশ্চিত আমি মারা যাব' বা 'নিশ্চিত যে, আমার 'করোনা' হবেই'; যেমন-'নিশ্চিত যে, 'মসজিদে গেলে আমার করোনা হবেই'; কিংবা 'নিশ্চিত যে, মসজিদের উদ্দেশে বের হলেই পথিমধ্যে শত্রু আমাকে হত্যা করবেই'; কিংবা 'এমনকি এ মুহূর্তে বা অমুক নির্দিষ্ট দিনে বা স্থানে বা সময় পর্যন্ত যদি আমি নিজ বাসা-বাড়ি-দোকানেও নামাযে দাঁড়াই, তা হলেও শত্রু অবশ্যই আমার ওপর হামলে পড়বে'। এমন সব নিশ্চিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শরীয়তেরই নির্দেশ বা নির্দেশনা হচ্ছে, 'আপনি মসজিদে যাবেন না; জামাতে অংশগ্রহণ আপনার জন্যে নয়; এমনকি তেমন পরিস্থিতিতে আপনি বাসা-বাড়িতেও সালাত আদায় করবেন না'। তবে হ্যাঁ, পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক ও শান্ত হবে তখন আপনি সেই নামায বা আমল যদি ফরয বা ওয়াজিব স্তরের হয়; তা কাযা করে নেবেন। আর তা যদি সুন্নাত-নফল স্তরের কোন আমল হয়, তা হলে সেটি আর কাযাও করতে হবে না এবং তাতে কোন পাপও হবে না।

এখন বলুন তো, 'আপনি কি নিশ্চিত যে, উক্ত সব অবস্থায় বা এমনিতেই আপনার করোনা রোগ হবে? অথবা 'করোনা রোগ' হলেই, আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি অবশ্যই মারা যাবেন?' না, না তেমনটি কারও বেলায়ই 'নিশ্চিত' নয়; বরং 'সম্ভাব্য' অথবা 'অনেকটা সম্ভাব্য'। সুতরাং শরীয়া আইন গবেষণা'র উক্ত নিয়ম-বিধি অনুযায়ী তিনটি পরিস্থিতি অর্থাৎ 'সম্ভাব্য বা শঙ্কা-আশংকা'র কোন মূল্য নেই; তাই বিধি মোতাবেক যাদের ওপর ওয়াজিব, তাদেরকে কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে। আর যাদের সঙ্গত কারণে তেমন 'প্রবল আশঙ্কা' হবে, তাঁদেরও কুরবানী দিতে হবে। তবে হ্যাঁ, সার্বিক সতর্কতার প্রতিও যত্নবান থাকতে হবে; স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চলতে হবে। আর আইন-বিধানের তৃতীয় 'নিশ্চিত' অবস্থা বা পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের 'করোনা' পরিস্থিতির ব্যাপারে বলা

যাচ্ছে না বা প্রযোজ্য বা প্রয়োগ করা যাচ্ছে না; তাই তেমন চিন্তা-কল্পনাও বাতিল, অবান্তর।

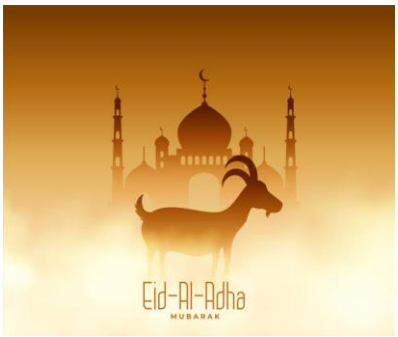

দুই. কুরবানী : ফাযায়েল

ঈদুল আযহা'র মর্যাদা : হযরত আনাস ইবন মালিক রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলিয়্যা যুগে প্রতি বছরে দু'টি দিন এমন নির্ধারিত ছিল যার মধ্যে তারা খেলাধুলা (আনন্দ-ফূর্তি) উদযাপন করতো। রাসূল (সা) যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন ইরশাদ করলেন, "তোমাদের এখানে দু'দিন এমন ছিল যাতে তোমরা খেলাধুলা করতে, আনন্দ-খুশি উদযাপন করতে; মহান আল্লাহ্ আরও শ্রেষ্ঠ দু'দিন দ্বারা তোমাদের ওই দু'দিনকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন– অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিবস এবং ঈদুল আযহা দিবস"।

কুরবানীর অর্থঃ আরবী 'কুরবান' ও 'কুরবাতুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য লাভ করা, হোক তা পশু কুরবানীর দ্বারা বা অন্য কোনভাবে। একইভাবে 'কুরবাতুন' যেসব নেক আমল দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয় যেমন ইবাদত-আনুগত্য, কল্যাণকাজ ইত্যাদিকেও বোঝায়। বাংলা ভাষায় 'কুরবানী' মানে ত্যাগ, উৎসর্গ করা, পশু কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তবে হাদীস, ফিকহ-ফাতাওয়া ইত্যাদি গ্রন্থে 'কুরবানী' এর পরিবর্তে 'উদ্বহিয়্যা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে, "আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনকল্পে কুরবানীর দিনে যে পশু জবাই করা হয়, তারই নাম 'কুরবানী'। একই কারণে কুরবানীর দিনকে 'ইয়াওমুল-আদ্বহা' ও কুরবানীর ঈদকে 'ঈদুল-আদ্বহা' বলা হয়।"।

ফাযাইল : (১) মহানবী (সা) ইরশাদ করেন "ঈদুল-আযহা'র দিনগুলোতে মহান আল্লাহর কাছে আদম-সন্তানদের সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে, তাদের পশু কুরবানী করা। আর এ পশুর শিং, লোম ও খুর কিয়ামত দিবসে তার পক্ষে (সাক্ষী হিসাবে) উপস্থিত হবে। এ কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই, আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী করো।

(২) আরেকটি হাদীসে এসেছে "সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এ কুরবানী'র স্বরূপ কি? মহানবী (সা) উত্তরে বললেন, 'এটা হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত-আদর্শ।' সাহাবাগণ পুনঃ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এতে আমাদের কি লাভ হবে? নবীজী (সা) উত্তরে বললেন, 'তার প্রত্যেকটি লোমের বিনিময়ে এক-একটি করে পুণ্য রয়েছে'। তাঁরা পুনঃ আরজ করলেন, পশমের (ভেড়া ও দুম্বা) ক্ষেত্রেও? তিনি জবাব দিলেন, এগুলোরও প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে"।

(৩) মহানবী (স) আরও ইরশাদ করেন 'যার কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে কুরবানী না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে'।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন, 'ঈদুল-আযহা দিবসের পরেও আরও দু'দিন কুরবানী করা যায়। একই রকম বর্ণনা হযরত আলী (রা)-সূত্রেও বিদ্যমান'।

একই রকম বর্ণনা হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও হযরত আনাস (রা) থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

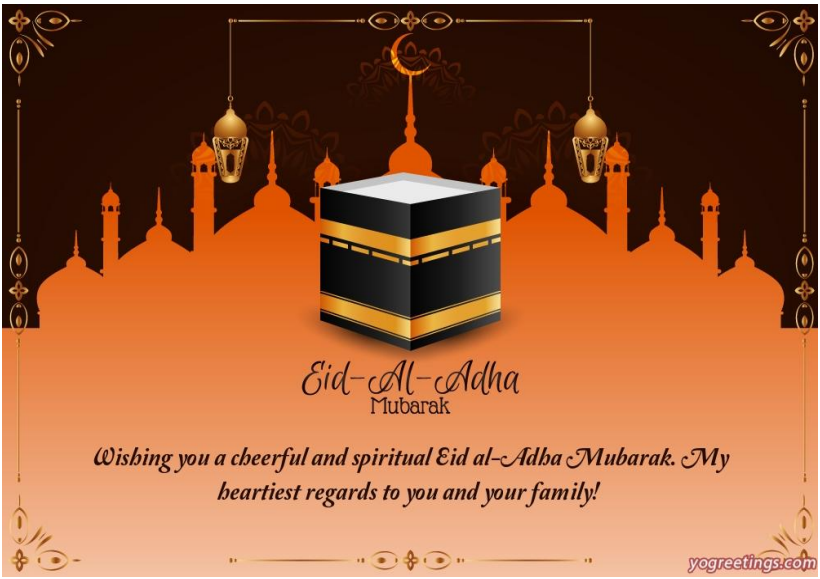

তিন.

কুরবানী : নিয়ম বা মাসাইল

কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? : যাদের ওপর যাকাত বা ফেৎরা ওয়াজিব হয়ে থাকে তাদের ওপর কুরবানীও ওয়াজিব। তবে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ সারা বৎসর হাতে থাকা শর্ত; আর ফেৎরা

ও কুরবানী'র ক্ষেত্রে যথাক্রমে ঈদুল-ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের সময় এবং কুরবানী'র তিনদিন ওই পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই, ফেৎরা ও কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে।

'নিসাব' মানে? : নিসাব মানে যাকাত বা ফিতরা বা কুরবানী প্রদানযোগ্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ। আর যিনি এই সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তাঁকে বলা হয় 'মালিকে নিসাব' অর্থাৎ কুরবানী ইত্যাদি দানযোগ্য একজন সম্পদশালী। কেবল স্বর্ণের ক্ষেত্রে নিসাব হচ্ছে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ যা বর্তমান হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৮৭.৫ গ্রা. বা ৮৮ গ্রাম স্বর্ণ হয়; এবং কেবল রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিসাব হচ্ছে ৫২.৫ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা রূপা, যা বর্তমান হিসাব মতে প্রায় ৬১৩ গ্রাম রৌপ্য হয়।

উল্লেখ্য, ১। শরীয়তের হিসাব মোতাবেক ৭.৫ সাড়ে ভরি সোনার যে কথা বলা হয়, তাতে প্রতি ভরি হয়ে থাকে ১২ গ্রাম স্বর্ণে (প্রায়) অথচ বর্তমানে প্রতি ভরি স্বর্ণে থাকে ১০ গ্রাম স্বর্ণ। সে হিসাবে বর্তমানে তা হবে ৮ ভরি ৭ গ্রাম তথা ৮৭.৫ গ্রাম প্রায়। সুতরাং স্বর্ণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম স্বর্ণ থাকলে যাকাত বা কুরবানী ফরয/ওয়াজিব হবে না।

২। একইভাবে রূপার ক্ষেত্রে মূল হিসাবে ৬১২ গ্রাম+৩৬০মি. গ্রাম. অর্থাৎ সামান্য কম ৬১৩ গ্রাম, তাই আমরা বুঝা ও মনে রাখার সুবিধার্থে পুরো ৬১৩ গ্রামই দেখালাম। এর চেয়ে কম রূপা থাকলে যাকাত বা কুরবানী ইত্যাদি ফরয/ওয়াজিব হবে না।

সামর্থবান প্রত্যেক মুকীম সাবালক মুসলমান (নর-নারী) এর ওপর প্রতি বছরই কুরবানী করা ওয়াজিব। 'সামর্থবান' বলতে যিনি 'হওয়ায়েজে আসলিয়া' তথা দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদেও কুরবানীর দিনগুলোতে ৮৭.৫ সাড়ে সাতাশি গ্রাম সোনার বা ৬১৩গ্রাম রূপার কিংবা এর কোন একটির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হবেন তাঁর ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে।

কুরবানীর সময় : ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের পর হতে ১২ই যিলহাজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট এ তিনদিন কুরবানী করার সময়। তবে প্রথমদিনে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

১। বিধি মোতাবেক যেখানে জুমু'আ ও ঈদের সালাত জরুরী হয়ে থাকে সেখানে ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। আর যেখানে বিধি মোতাবেক ঈদের জামাত জরুরী হয় না সেখানে ফজরের পরেই কুরবানী করা যায়।

২। নিজের কুরবানীর পশু নিজহাতে জবাই করা উত্তম; তবে মেয়েলোক হলে অথবা অন্য কোন কারণে অপর কাউকে দিয়ে জবাই করলেও বাধা নেই। অবশ্য সাহস থাকলে মেয়েলোক নিজেও নিজ কুরবানীর পশু জবাই করতে পারে।

৩। কুরবানীর পশু জবাই করার সময় মুখে নিয়ত করা বা দু'আ উচ্চারণ করা জরুরী নয়; করলে ভালো। তাই কেবল অন্তরে নিয়ত রেখে মুখে সশব্দে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করলেই কুরবানী সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যায়।

৪। কুরবানী শুধু ব্যক্তির নিজের ওপর ওয়াজিব হয়। পুত্র-কন্যা বা স্ত্রীর কুরবানীযোগ্য নিজস্ব সম্পদ থাকলে, তাদের কুরবানী পৃথকভাবে তাদের ওপর ওয়াজিব হবে। তাই পূর্ব-আলোচনা ব্যতীত এবং একে-অপরকে দায়িত্ব বা অনুমতি প্রদান ব্যতীত কুরবানী করলে তা শুদ্ধ হবে না।

৫। সন্তান নাবালক হলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং নাবালকের সম্পদ থাকলেও তা থেকে কুরবানী করা বৈধ নয়। তবে পিতা বা অন্য কেউ নিজের সম্পদ দ্বারা তেমন নাবালকের পক্ষে কুরবানী করলে, তা হবে নফল কুরবানী। একইভাবে যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব সে নিজের ওয়াজিব পরিহার করে স্ত্রী/বাবা-মা বা অন্য কারও নামে কুরবানী করলে তাও শুদ্ধ হবে না।

৬। সঠিক নিয়ম হল, যাদের একাধিক পশু বা সাতজন শরীক হতে পারে এমন বড় একটি পশুর একাধিক শেয়ারের সক্ষমতা রয়েছে; তাঁরা প্রথমে নিজের ওয়াজিব পালনে একটি পশু বা একটি শেয়ার প্রদানের পর অবশিষ্ট পশু বা শেয়ারগুলো স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বাবা-মা, দাদা-দাদী, শ্বশুর-শাশুড়ী, পীর-উস্তাদ এবং রাসূল (সা)-এর নামেও কুরবানী করতে পারেন।

সুতরাং, নিজের ওয়াজিব পালনের পাশাপাশি সামর্থ্য থাকলে, নফল হিসাবে মহানবী (সা)-এর নামে, জীবিত বা মৃত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, শ্বশুর-শাশুড়ী, পীর-উস্তাদ প্রমুখের পক্ষেও কুরবানী করা অনেক উত্তম। এতে তাঁদের আমলনামায়ও বিশাল অঙ্কের সওয়াব যোগ হবে। উদাহরণত, যারা এককভাবে এক বা একাধিক পশু বা একাধিক অংশ কুরবানী করেন, তাঁরা একটি বা এক নাম নিজের ওয়াজিব হিসাবে দিয়ে অবশিষ্ট অংশে পিতা-মাতা, স্ত্রী প্রমুখের নামে দিতে পারেন।

৭। উল্লেখ্য, 'নামে' বলতে অনেকে আবার প্রশ্ন করেন, 'কুরবানী তো একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই হওয়ার কথা?' তার জবাব হল, আসলে সাধারণ জনগণের বাক্যালাপের প্রচলিত বাকধারায় এবং বোঝার স্বার্থে বলা হয়ে থাকে, 'অমুকের নামে'; কিন্তু মূলত এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অমুকের নামে অর্থ 'অমুকের

পক্ষে বা পক্ষ থেকে' কুরবানী করা হচ্ছে। আর 'আল্লাহ্‌র নামে' বলতে, 'তাঁর উদ্দেশ্যে বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে'। মনে রাখা চাই যে, শরীয়া আইন গবেষণা'র মূলনীতিতে বলা হয়েছে- অর্থাৎ "সর্ব-সাধারণ, জনগণ যেসব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে এবং কথা বলে থাকে; তাতে তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী? শরীয়া আইনের বিবেচনায় সেটাই ধর্তব্য; তারা মুখে শব্দ বা বাক্য কি বললো, তা ধর্তব্য নয়"। সুতরাং এসব নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অবকাশ শরীয়তে নেই।

৮। কেউ ১০ই যিলহজ বা ১১ই যিলহজ পর্যন্ত সফরে ছিল বা গরীব ছিল; ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ি পৌঁছেছে বা সম্পদশালী হয়েছে অথবা সফররত অবস্থায় কোথাও ১৫দিন অবস্থানের নিয়ত করেছে; এমতাবস্থায় তাঁর ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৯। কারও কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানীর তিনটি দিনই অতিবাহিত হয়ে গেল, সে কুরবানী করলো না বা করতে পারলো না। তা হলে এমতাবস্থায় একটি ভেড়া বা ছাগলের মূল্য দান করে দিবে। যদি ছাগল বা ভেড়া ইত্যাদি ক্রয়ও করে থাকে, সেক্ষেত্রে ওই পশুটিই আস্ত বা জবাই করে গরীব-মিসকীনদের বন্টন করে দিতে হবে।

'কাযা কুরবানী' বা যে কুরবানী ১০-১২ এ তিনদিনের মধ্যে যবাই করতে পারবে না– এমন কুরবানীর জন্তুর গোশত নিজে বা ধনী কেউ খেতে পারবে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে এমন জন্তু ওয়াজিব সাদকা ও মান্নতের পশুর কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

১০। কারও ওপর বিধি মোতাবেক গরীব হওয়াতে কুরবানী ওয়াজিব নয়; কিন্তু সে নিজে ইচ্ছা-নিয়ত করেই কুরবানী দানের জন্য পশু ক্রয় করেছে– সেক্ষেত্রে মূলে তার ওপর ওয়াজিব না থাকলেও এখন সে নিজেই নিজের ওপর তা আবশ্যক করে নিয়েছে। কেননা শরীয়তের বিধান মতে কেউ নফল কাজের নিয়ত করে তা শুরু করলে সেটি তখন তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

১১। কেউ কোন উদ্দেশ্য পূরণের নিয়তে কুরবানী করার মান্নত করেছিল; এতে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল, তা হলে সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে কুরবানী করা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে এবং এমন মান্নতের কুরবানীর গোশত কেবল গরীব লোকজনই খেতে পারবে। নিজেও খেতে পারবে না এবং ধনী কারও জন্যও তা খাওয়া জায়েয হবে না।

১২। কেউ নিজ সন্তুষ্টি মতে কোন মৃত ব্যক্তির রূহে সওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে নফল কুরবানী দান করলে সেই কুরবানীর গোশতের বিধান সাধারণ কুরবানীর মতই অর্থাৎ নিজে, ধনী-গরীব সকলেই তার গোশত খেতে পারবে।

১৩। তবে এমন যদি হয় যে, কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কুরবানী করার ওসিয়ত করে গিয়েছিল এবং তার ওয়ারিসগণ সেই ওসিয়ত বাবদ কুরবানী যবাই করেছে। তা হলে এমন কুরবানীর গোশতও নিজেরা খেতে পারবে না এবং ধনী কাউকে খেতে দিতে পারবে না।

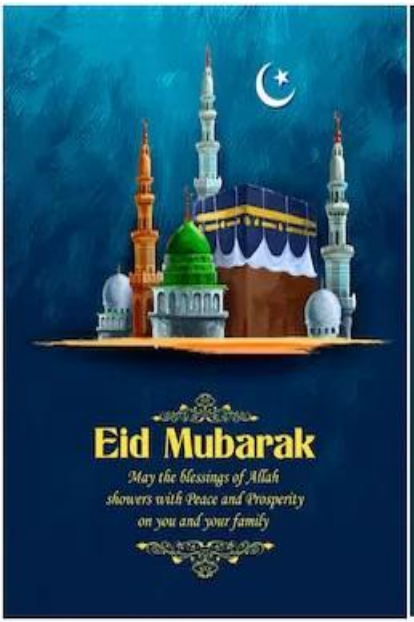

কুরবানীর পশু : ১। ছাগল, খাসী, পাঠা, দুম্বা, ভেড়া নর-মাদী জন্তুতে শুধু একজন বা এক নামেই কুরবানী করা বৈধ হয়। আর গরু, মহিষ ও উট –এ তিন প্রকারের জন্তুতে এককভাবে অথবা সর্বোচ্চ সাতজনে মিলে কুরবানী দেয়া বৈধ হয়। তবে শরীকদের কারও অংশ এক-সপ্তমাংশের কম হলে কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

শরীকী কুরবানী ও হাদীস : আবার শরীকদের কারও অংশ যদি পশুটির অর্ধেক হয় বা এক-তৃতীয়াংশ হয় অর্থাৎ দু'জনে বা তিনজনে সমান হারে কুরবানী দিচ্ছেন তাতেও কোন সমস্যা নেই; বরং ভালো। মোটকথা একজন শরীকের অংশ যেন এক-সপ্তমাংশের কম না হয়; সেটাই মূল বিবেচ্য ও ধর্তব্য।

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, 'আমরা তাকবীর-তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর সঙ্গে হজে বের হলাম।

রাসূল (সা) আমাদের নির্দেশ দিলেন আমরা যেন উট ও গরুর মধ্যে শরীক হয়ে যাই –আমাদের প্রতি সাতজন করে একটি পশুতে'।

'হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উটও সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, বৈধ হবে'।

২। ভেড়া, ছাগল-খাসী, দুম্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে জন্তুটির কমপক্ষে এক বছর বয়স হওয়া চাই। তবে সমস্য ও পশু-সংকট থাকলে দুম্বার ক্ষেত্রে মোটা-তাজা ছয় মাসোর্ধ হলেও জায়েয হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখতে যদি এক বছর বয়সী দুম্বার মত মনে হয়। ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটাতাজা মনে হলেও এক বছরের কম বয়সে শুদ্ধ হবে না। গরু, মহিষ এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'বছর বয়সের হওয়া চাই এবং উটের ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সের হওয়া চাই।

৩। কুরবানীর জন্তুটি সুস্থ সবল ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া চাই। যদি সামান্য ত্রুটি থাকে যেমন কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম কাটা হয় ইত্যাদি, তাতেও কুরবানী শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অধিক দোষ-ত্রুটি থাকে, সেক্ষেত্রে মোটেও কুরবানী সহীহ হবে না।

৪। কুরবানীর জন্তু ক্রয় থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ, ঘাস খাওয়ানো, জবাই, বন্টন ইত্যাদি সর্বপ্রকার যৌথ খরচ, দায়-দায়িত্ব আনুপাতিক হারে সকল অংশীদারকে বহন করতে হবে; নতুবা কুরবানী সহীহ হবে না। অংশ অনুপাতে সমান হারে গোশত ইত্যাদি বন্টন করতে হবে; তবে সম্মতি সাপেক্ষে পায়া/মাথা/ভুড়ি কোন শরীক যদি না নেয় বা কম নেয়, তাতে কোন সমস্যা নেই।

৫। যে জন্তুটি এ পরিমাণে খোঁড়া যে, তিন পায়ে চলে থাকে চতুর্থ পা মাটিতে রেখে ভর দিতেও পারে না –এমন জন্তুর দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি এমন খোঁড়া হয় যে, ওই খোঁড়া পা দ্বারাও ভর দিতে পারে তা হলে এমন পশু দ্বারাও কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে; যদিও সামর্থ্য থাকা সাপেক্ষে অধিক উত্তম হবে, সম্পূর্ণ সুস্থ্য ও সবল একটি পশু কুরবানী প্রদান করা।

৬। যে জন্তুটির একেবারেই দাঁত নেই (অর্থাৎ বৃদ্ধ হয়ে সব পড়ে গেছে) এমন পশুর দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। তবে এমন যদি হয় যে, যে-কয়টি পড়ে গেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক বিদ্যমান আছে; তা হলে সেক্ষেত্রে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে।

৭। যে জন্তুটির জন্মগতভাবেই শিং উঠেনি কিংবা উঠেছিল এবং আগা থেকে ভেঙ্গে গেছে, তার দ্বারাও কুরবানী সহীহ হবে; তবে শিং যদি গোড়া থেকেই উপড়ে যায়, সেক্ষেত্রে তার দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

৮। হৃষ্টপুষ্ট করার জন্যে জন্তুটিকে খাসী বানিয়ে দিলে, এটিকে দোষরূপে গণ্য করা হয় না এবং তেমন জন্তুর কুরবানীও জায়েয হয়ে থাকে।

৯। সুস্থ জন্ত ক্রয়ের পর তার মধ্যে এমন কোন দোষ বা রোগ দেখা দিল, যে কারণে তার দ্বারা কুরবানী সহীহ হয় না। সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তে আরেকটি জন্তু ক্রয় করে কুরবানী দিতে হবে। তবে লোকটি গরীব হলে, সেটি দ্বারাই তার কুরবানী হয়ে যাবে।

গোশত : ১। কুরবানীর গোশত কুরবানীদাতা, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলেই খেতে পারে। এমনকি অমুসলিমদেরও তা প্রদান বা আহার করা বৈধ।

২। তবে যাকাত, ফেৎরা ও কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি বাধ্যতামূলক দানগুলো অমুসলিমদের প্রদান বৈধ নয়। সুতরাং কুরবানী'র গোশত কোন অমুসলিমকে প্রদান বৈধ হয় বিধায় তার ওপর ভিত্তি করে কোন অমুসলিমকে যাকাত ইত্যাদি প্রদান বৈধ মনে করা যাবে না।

৩। তা ছাড়া, কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান হচ্ছে, তা তিন ভাগ করে একভাগ নিজে, একভাগ স্বজনদের এবং একভাগ গরীবদের প্রদ্দান 'মুস্তাহাব' তথা ভালো। কিন্তু প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রম বা কমবেশি করলেও কোন পাপ হবে না। অবশ্য, যত বেশি পরিমাণ গরীবদের দেয়া হবে ততবেশি উত্তম ও অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে।

৪। মান্নতের কুরবানী, ওসিয়্যত পালনের কুরবানী এবং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশত কুরবানীর সুনির্দিষ্ট তিনদিনে তা পালন করতে না পারায়, পরে তা কাযা করছেন– সেক্ষেত্রে এ তিন প্রকার কুরবানীর গোশত নিজে বা ধনী কাউকে দান বা আহার করা বা করানো বৈধ নয়। তা কেবল গরীবদের মাঝেই বণ্টন করতে হবে।

৫। **কুরবানী ও আকীকা :** 'ছেলে সন্তান হলে আকীকায় দু'টি ছাগল বা দু'টি ভেড়া ইত্যাদি; আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা একটি ভেড়া জবাই করার নিয়ম। কিংবা কুরবানী'র গরু ইত্যাদির মধ্যে ছেলের জন্য দু'অংশ আর মেয়ে'র জন্য এক অংশ বা শেয়ার নিতে পারে। তেমন সচ্ছল না হলে বা সামর্থ্যে না কুলালে ছেলের জন্যও একটি ছাগল বা কুরবানীতে এক অংশও নিতে পারে'।

৬। যেসব জন্তু দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হয় তা দ্বারা আকীকাও শুদ্ধ হয়ে থাকে; আর যেসব পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয হয় না, তা দ্বারা আকীকাও জায়েয হয় না।

৭। তবে কুরবানী যাদের ওপর ওয়াজিব বলে গণ্য; তারা কুরবানী বাদ দিয়ে আকীকা করলে, তা শুদ্ধ হবে না। কারণ, আকীকা ওয়াজিবও নয়, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও (গরীবদের জন্যও নয়) নয়; বরং তা সুন্নাতে গায়রে-মুয়াক্কাদা'

পর্যায়ের। যে-কারণে অসমর্থ কেউ আকীকা না দিলে, তার কোন পাপ হয় না, ইত্যাদি।

৮। কুরবানীর অনুরূপ আকীকার গোশতও আকীকাদাতা নিজে, স্ত্রী-কন্যা, ছেলে-মেয়ে, আপন-পর, ধনী-গরীব, সকলকে বণ্টন করে দেয়া যায়, রান্না করে খাইয়ে দেয়া যায়।

৯। **কুরবানীর চামড়া :** কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়ান্তে তা কেবল ফকীর-মিসকীনের হক হয়ে যায়। যেকারণে চামড়ার মূল্য একমাত্র তাদেরকেই দেয়া যাবে যারা বিধি মোতাবেক যাকাত, ফেৎরা গ্রহণ করতে পারে।

১০। কোন ধনী বা সচ্ছল ও অমুসলিম ব্যক্তিকে যেমনিভাবে যাকাত, ফেৎরা দেয়া যায় না; কুরবানীর চামড়ার অর্থও এদের কাউকে দেয়া যায় না। একইভাবে তা ব্যাপক জন-কল্যাণমূলক যৌথ কোন কাজে বা প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানোর জন্যেও প্রদান করা জায়েয নয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠান বা সমিতি-সংস্থার তত্ত্বাবধানে যদি কোন গরীব-দরিদ্র লোকজন বা ছাত্র-শিক্ষার্থী থাকে তাদেরকে প্রদান করা জায়েয; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে যারা দরিদ্র অথচ ধর্মীয় কাজে বা শিক্ষায়রত তাদেরকে তা প্রদান করা উত্তমও বটে।

উদাহরণত, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, হাসপাতাল বা কোন সমিতি, সংস্থাকে তাদের নির্মাণ-কাজ বা বেতন ইত্যাদি বাবদ তা দেয়া যাবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট বৈধ ব্যয়খাত হিসাবে সংশ্লিষ্ট গরীব অসহায়দের সরাসরি মালিক বানিয়ে দেয়ার যেশর্ত অবশ্য পালনীয়; তা পালিত হয় না এবং সম্ভবও হয় না। অবশ্য মাদরাসা, মসজিদ বা এতিমখানার গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের, গরীব শিক্ষক/ ইমাম/ মুয়াযযেন/ খাদেম প্রমুখকে প্রদান করা বৈধ হয়। কিন্তু এদের কাউকেও তা বেতন বা পারিশ্রমিক বিবেচনায় প্রদান করা জায়েয নয়।

১১। **কুরবানীর পশু জবাই করার নিয়ম :** কুরবানী করার নিয়ম হচ্ছে, জন্তুটিকে কিবলামুখী শায়িত করে যথাসাধ্য অধিক ধারালো চুরি বা চাকু দ্বারা জবাই করবে। 'ইন্নি ওয়াজ্জাহতু.....' আরবী দু'আটি পাঠান্তে, কার কার বা কয়জনের পক্ষে কুরবানী হচ্ছে তা পূর্বে জেনে নিয়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করবে।

১২। জবাই-পূর্ব মুহূর্তে যেমন মনে থাকবে, 'হে আল্লাহ! আপনিই এ পশু সম্পদ দিয়েছেন এবং আপনার নামেই তা কুরবানী করছি'। একইভাবে জবাই শেষে বলবে, 'হে আল্লাহ! এ কুরবানীকে সেভাবে কবূল করে নিন, যেভাবে তা আপনার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আপনার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষ থেকে কবূল করেছিলেন'।

চার. কুরবানীর গোশত : সামাজিক বন্টন ও বিবাদ-বিতর্ক প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ১। কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে বন্টন করা কি জরুরী? যারা সাত শেয়ারের মধ্যে মাত্র এক শেয়ার নিয়ে থাকেন তাদের জন্যও কি তিন ভাগের একভাগ গরীবদেরকে দান করা জরুরী? ২। এই একভাগ সমাজের মাতবরদের কাছে জমাদান কি জরুরী? নিজেদের মত করে দান করলে কি তা শুদ্ধ হবে না? ৩। মহল্লা বা সমাজের যারা তিনভাগের একভাগ সমাজের ভাগে জমা না দেয় তাদের সমালোচনার পাত্র বানানো হয়; নানান বিরূপ মন্তব্য করা হয় এবং এসব নিয়ে প্রতি বছর বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও একটা অস্বস্থিকর পরিবেশ তৈরি হয়। ৪। সমাজের ভাগে সকলের দেয়া অংশ আবার একত্র করে পুনরায় সবার বাড়ি বাড়ি বন্টন করে দেয়া হয়। এর রহস্য কি? শরীয়তে কি এমন কোন নির্দেশ আছে? ৫। বিশেষত সমাজের এসব সদস্যদের মাঝে যেখানে ভালো-মন্দ সুদখোর, ঘুষখোর, হারাম উপার্জনের দ্বারা কুরবানী দাতা লোকজনও থাকে। ৬। এমন ভালো-মন্দ সকলের একখানে করা যে গোশত পুনরায় সবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছায়ে দেয়া হয়, বাছ-বিচার না করে ওই গোশত খাওয়া কি ঠিক হবে? –প্রশ্নগুলোর শরীয়তসম্মত সমাধান নিম্নরূপ:

১। প্রথমে এতদসংক্রান্ত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কয়েকটি বাণীর প্রতি লক্ষ্য করি:

ক. মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন: "এরপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও"। খ. মহানবী (সা) ইরশাদ করেন: হযরত জাবির (রা)-এর বরাতে মহানবী (সা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) প্রথমদিকে কুরবানীর গোশত তিনদিন পরে আর খেতে নিষেধ করেছেন। তারপর আবার পুনঃ ইরশাদ করেছেন: 'তোমরা তারপরও খেতে পার; পাথেয় হিসাবে (সফর

ইত্যাদি প্রয়োজনে) সঙ্গে নিয়ে যেতে পার এবং সঞ্চিতও করে রাখতে পার'। গ. তিনি আরও ইরশাদ করেন: "হযরত বুরাইদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদেরকে তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম, যেন সামর্থ্যবান ধনীরা দুস্থদের তা থেকে প্রদান করে। বাস্! এখন থেকে তোমরা যা ইচ্ছে তা থেকে আহার কর, অন্যদের আহার করাও এবং জমা করেও রাখতে পার"। ঘ. "হযরত ইবন রবীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করেছিলেন? তিনি বললেন: না, তবে কুরবানী করতে সক্ষম লোকের সংক্যা ছিল খুবই কম। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদেরকেও যেন গোশত খাওয়ানো যায়। আমরা কুরবানীর পশুর পায়া রেখে দিতাম এবং দশ দিন পরও খেতাম"। হযরত আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ"। ঙ. এ পর্যায়ে উপরিউক্ত কুরআনের বাণী ও হাদীসের বর্ণনাকে সামনে রেখে ফিকহ্-ফাতাওয়ার এ সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ লক্ষ করি:

"কুরবানীর গোশত : কুরবানীর গোশত কুরবানীদাতা, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলেই খেতে পারে।এমনকি অমুসলিমদেরও তা প্রদান বা আহার করা বৈধ। তবে যাকাত, ফেৎরা ও কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি বাধ্যতামূলক দানগুলো অমুসলিমদের প্রদান বৈধ নয়। সুতরাং কুরবানী'র গোশত কোন অমুসলিমকে প্রদান বৈধ হয় বিধায় তার ওপর ভিত্তি করে কোন অমুসলিমকে যাকাত ইত্যাদি প্রদান বৈধ মনে করা যাবে না।

তা ছাড়া, কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান হচ্ছে, তা তিন ভাগ করে একভাগ নিজে, একভাগ স্বজনদের এবং একভাগ গরীবদের প্রদ্দান 'মুস্তাহাব' তথা ভালো। কিন্তু প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রম বা কমবেশী করলেও কোন পাপ হবে না। অবশ্য, যত বেশী পরিমাণ গরীবদের দেয়া হবে ততবেশী উত্তম ও অধিক সওযাব পাওয়া যাবে।

মান্নতের কুরবানী, ওসিয়্যত পালনের কুরবানী এবং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশত কুরবানীর সুনির্দিষ্ট তিনদিনে তা পালন করতে না পারায়, পরে তা কাযা করছেন– সেক্ষেত্রে এ তিন প্রকার কুরবানীর গোশত নিজে বা ধনী কাউকে দান বা আহার বৈধ নয়। তা কেবল গরীবদের মাঝেই বন্টন করতে হবে"।

২। উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে আমাদের মনের অনেক প্রশ্নেরই জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য তিন ভাগ করার যে কথা, তা সরাসরি কোন হাদীসে আছে মর্মে এখনও আমার অধ্যয়নে পাইনি; তবে থাকতেও পারে। কারণ, আমি তো আর সব হাদীসের হাফেয নই। অবশ্য ফিকাহর কিতাবে তিন ভাগ করা এবং তা মুস্তাহাব মর্মে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এটি হয়তো বাস্তবতার নিরীখে এবং কিয়াস ও যৌক্তিকতার বিবেচনায় গবেষক ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ১. কুরবানীদাতা ও পরিবারস্থগণ ২. আত্মীয় ও প্রতিবেশী ও ৩. দুস্থ-দরিদ্রগণ। সুতরাং তিনভাগ করাই বাঞ্ছনীয় ছিল, বলা যায়।

৩। এ ছাড়া, উপরে ঘ. ক্রমিকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রথমদিকে যেহেতু কুরবানীদাতার সংখ্যা কম ছিল, তাই নবীজী গরীবদের কথা বা যারা কুরবানী দিতে পারেনি; তাদের প্রতি বিবেচনা করে বলেছিলেন: তিন দিনের বেশি না খাওয়া এবং জমা করেও না রাখা চাই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন কুরবানীদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তখন পূর্বের নির্দেশনা শিথিল করে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সব কথা বা প্রশ্নের জবাব খোদ হাদীস শরীফেই বিদ্যমান। সুতরাং ফাতাওয়ার কিতাবেও সেভাবেই বিধান শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

এবার একটু চিন্তা করে দেখি, সেই নবী-যুগে ও সাহাবা-তাবেঈ যুগে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যে পর্যায়ে ছিল, তার চেয়ে অনেক অনেক উন্নত অবস্থানে বর্তমানে আমরা বাস করছি।

সুতরাং একেতো তিনভাগ করার কথাটি মুস্তাহাব, ফরয-ওয়াজিব বা সুন্নাতের মধ্যেও গণ্য নয়; আবার সে যুগের অনুরূপ দুস্থ-গরীব লোকজন এ যুগে কই? বা কয়জন আছে? সুতরাং সামাজিকভাবে কমিটি করে তা বাধ্যমূলক করতে

যাওয়ার প্রয়োজন কি? আবার জোরাজুরি করা, সমালোচনা করা, বিবাদ-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন কি?

আমাদের ইমাম ও খতীব মহোদয়গণ ঈদের পূর্বের জুমু'আর বয়ানে, এমনকি ঈদের জামাতেও বিষয়টি সবাইকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন। যেহেতু ব্যাপারটি একান্তই মুস্তাহাব তাই এর চেয়ে বেশি কিছু করতে যাওয়া অবশ্যই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়।

৪। শরীয়া আইনের আইন গবেষণা নীতিমালায় বলা হয়েছে– অর্থাৎ 'শরীয়ত যাকে বা যে-বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করেনি, সেটিকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া'/ 'শরীয়ত যে-বিষয়কে জরুরী সাব্যস্ত করেনি, সেটিকে জরুরী সাব্যস্ত করা বা তেমন ভাবা' -এর বিবেচনায়ও, এভাবে তিনভাগ করতে বাধ্য করা বা সমাজের ভাগে দিতে বলা কিংবা এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে যাওয়া কোনটাই বৈধ নয়।

৫। হ্যাঁ, তেমন সামাজিক উদ্দোগ গ্রহণ করা যায় শরীয়তের ইতিবাচক বা নেতিবাচক অত্যাবশ্যকীয় কোন কাজে, যেমন: ফরয সালাত ও ফরয রোযা ইত্যাদি অথবা মদ, গাঁজা, জুয়া বন্ধে বা অত্যাচার-অবিচার ও নারী-নির্যাতন বন্ধে আলোচ্য প্রকৃতির সামজিক উদ্দোগ বা কমিটি ইত্যাদি গঠন করে সকলে মিলেমিশে একে-অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ-জাতি ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য হবে; নফল-মুস্তাহাব কাজে নয়।

৬। এবার আপনার প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক জবাব লক্ষ্য করুন:

১। কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে বন্টন করা জরুরী নয়; তা বরং মুস্তাহাব অর্থাৎ করলে ভালো, না করলেও কোন পাপ হবে না। তবে ব্যক্তিগতভাবে কুরবানীদাতাগণ নিজ নিজ সামর্থ্য ও খুশি মনে যতটুকু ইচ্ছা দিতে পারেন। যিনি যত বেশি দিবেন তত অধিক সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। অবশ্য যাঁরা

একাই এক বা একাধিক পশু কুরবানী দিয়ে থাকেন, অথবা একাই কয়েক শেয়ার কুরবানী দিয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে উচিত ও নৈতিক দায়িত্ব হবে, শুধু তিনভাগের একভাগ নয় বরং আরও বেশি দান করে দেয়া। তা-ও সমাজের কাছে বা কোন কমিটির কাছে নয়; বরং তাঁর নিজের খুশি মনে ও সওয়াবের প্রত্যাশায় যাকে যেভাবে দিতে তাঁর মর্জি হয়, সেভাবেই তিনি দান-বন্টন করে দিবেন বা বাসা-বাড়িতে পৌঁছায়ে দিবেন। এটা ভিন্ন কথা যে, জনবলের প্রয়োজনে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত কারও সাহায্য এক্ষেত্রে নিতে পারেন।

২। না, এই একভাগ অথবা কম-বেশি যাই হোক তা সমাজের মাতবরদের কাছে জমাদান মোটেও জরুরী নয়। কুরবানীদাতাগণ নিজেদের মত করে দান করলেও তা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩। মহল্লা বা সমাজের যারা তিনভাগের একভাগ সমাজের ভাগে জমা না দেয় তাদের সমালোচনার পাত্র বানানো; কোন বিরূপ মন্তব্য করা এবং এসব নিয়ে বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক–সবকিছুই না-জায়েয ও নিষিদ্ধ।

৪। 'সমাজের ভাগে সকলের দেয়া অংশ আবার একত্র করে পুনরায় সবার বাড়ি বাড়ি বণ্টন করে দেয়া' –এর রহস্য তো আমারও বোধগম্য হচ্ছে না। শরীয়তে এমন কোন নির্দেশ নেই। তবে হ্যাঁ, যদি এমন হতো যে, বাধ্যতামূলক জ্ঞান না করে এবং কারও প্রতি চাপাচাপি না করে, স্বেচ্ছায় কেউ এমন উদ্দোগ নেয় যে, দেখুন! আমাদেরই পাড়া-প্রতিবেশী দুস্থ লোকজন তাঁরা একটু গোশতের জন্য আমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন– এটা বিবেকে বাঁধে; বা অমুক অমুক সম্মানী লোকজন কোন না কোন সমস্যার কারণে এ বছর কুরবানী দিতে পারেননি; অথচ তাঁরা তো আর আমাদের কাছে গোশত চাইতে বা নিতে আসবেন না; তাই আমরা তাঁদের বাসা-বাড়িতে স্বেচ্ছায় পৌঁছায়ে দিতে চাই। এমনটি হয়তো ক্ষণিকের জন্য মেনে নেয়া যায়। যদিও এক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন উঠবে এভাবে যে, কেন? ওই দুস্থ লোকটির প্রতিবেশি কুরবানীদাতা যাঁরা আছেন; অথবা

ওই সম্মানী লোকটির প্রতিবেশি যাঁরা আছেন তাঁরা –ডাবল বিবেচনায় অর্থাৎ একেতো প্রতিবেশী এবং দ্বিতীয়ত গরীব বা সম্মানী– সংশ্লিষ্টদের বাসা-বাড়িতে নিজেরাই কুরবানীর গোশত পৌঁছায়ে দিবেন। এতে আবার কমিটি বা সমাজের মাতবরির কী আছে?

কিন্তু যারা কুরবানী দিলেন, তাঁদের কাছ থেকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সমাজের নামে ভাগ নিয়ে আবার সেই গোশত ভাগ-বন্টন করে তাঁদেরই বাসা-বাড়িতে একভাগ একভাগ পৌঁছায়ে দেয়া হল! এমন তেলেছমাতির কথা তো শরীয়তে কোথাও বলা হয়নি!

উল্লেখ্য, পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আমরা এ যুগের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সেই প্রথম যুগের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে! আল-হামদুলিল্লাহ! বর্তমানে তো গ্রাম বলেন, পাড়া-মহল্লা বলেন, এমনকি এক-একটি বাড়ি-বিল্ডিং–এ ২/৪টি বা ৫/৭টি পর্যন্ত কুরবানী হচ্ছে। সুতরাং দূর থেকে গোশত উসূল করে বা কমিটি বানিয়ে দুস্থ-অসহায়দের জন্য গোশত কালেকশন করতে হবে কেন?

৫, ৬। 'বিশেষত সমাজের এসব কুরবানীদাতা সদস্যদের মাঝে যেখানে ভালো-মন্দ সুদখোর, ঘুষখোর, হারাম উপার্জনের দ্বারা কুরবানী দাতা লোকজনও থাকে'– এ বিষয়টিও বেশ ভাবার মত। এদিক বিবেচনায়ও, উক্তরূপ সামাজিক ভাগ বা উদ্দোগ বা পদক্ষেপ সঠিক নয়; এবং এভাবে ভালো-মন্দ একত্র করা অংশ সহীহভাবে কুরবানীদাতাদের গৃহে পৌঁছার পর তা আহার করাও সমীচীন হওয়ার কথা নয়। সুতরাং নামাযী ও মুত্তাকী লোকজনের তা থেকে বেঁচে থাকাই জরুরী হবে।

মোটকথা, ফাতাওয়াটি ভালো করে পাঠ করে, এলাকার ইমাম-খতীবসহ এবং প্রয়োজনে মুরুব্বিগণ ও স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের সাহায্য নিয়ে এসব বাতিল সামাজিক উদ্দোগ বা কমিটিকে নিষ্ক্রিয় করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে পরকালের ভয় সামনে রেখে সহীহ-সঠিক ও কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে কুরবানী করার তাওফীক দিন। আমীন! ♦

তথ্যসূত্রঃ

১. তায়াক্কুন বা ইয়াকীনী।

২. জানা আছে বা গোপন খবর আছে।

৩. আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাঃ মুফতী আমীমুল ইহ্সান র.ঃ পৃ-৭৫, ৮৮, ১০৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬১, ৫৯, ৯১, ১১৪, ১১৮, ১৪৩; আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত। ২। আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়েরঃ পৃ-১২, ১৩, ইত্যাদির বিধান চয়ন সংক্রান্ত নীতি-মূলনীতিগুলো দ্রষ্টব্য। ৩। 'হাফতে আখতার': হযরত শাহ আশরাফ আলী থানভী র.তা. বি. এইচ. এম. সাঈদ কোং, করাচীঃ (মূল গ্রন্থের ১৯৮-২২০পৃ- পর্যন্ত হজ ও কুরবানী বিষয়ে অনুরূপ মৌলিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা

স্থান পেয়েছে এবং ইফা'র মূফতির কৃত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদে তা ১৯১-২২০পৃ- পর্যন্ত দেখা যেতে পারে)।

৪. নাসাঈ শরীফ : দু'ঈদের সালাত অধ্যায়।

৫. আল-মুসত্বালিহাত ওয়াল-আলফাযুল-ফিকহিয়্যা: খ-৩, পৃ-৮০, দারুল-ফাযীলাহ, কাহেরা, মিসর।

৬. কাওয়াইদুল-ফিকহি: মুফতী আমীমুল ইহসান র.পৃ-১৮২।

৭. তিরমিযি ও ইবনে-মাজা : কুরবানী অধ্যায়।

৮. মুসনাদে আহমদ ও ইবনে-মাজা : কুরবানী অধ্যায়।

৯. তারগীব/মুসতাদরাকে হাকিম, ইবনে-মাজা : কুরবানী অধ্যায় ।

১০. মুয়াত্তা ইমাম মালেক+ যুজাজাতুল মাসাবীহ : রাবী হয়রত ইমাম আবূ হানীফা র. সূত্রে উত্তম সনদে বর্ণিত, কুরবানী অধ্যায়।

১১. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩০৪।

১২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক+ যুজাজাতুল মাসাবীহ : রাবী হয়রত ইমাম আবূ হানীফা র. সূত্রে উত্তম সনদে বর্ণিত, কুরবানী অধ্যায়।

১৩. সম্পাদনা পরিষদ: ফাতাওয়া ও মাসাইল, খ-৪, পৃ. ৮৪; ইফা, ঢাকা+ মাও: খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী: জাদীদ ফিকহি মাছাইল, খ-১, পৃ. ২০২; কুতুবখানা নঈমিয়া, দেওবন্দ, ভারত।

১৪. ৭.৫ তোলা স্বর্ণের যে কথা বলা হয় তা প্রাচীন হিসাব মতে ঠিক। তবে তখনকার ১ তোলা ছিল ১২ গ্রাম সমপরিমাণ; অথচ বর্তমানে বাজারে যে তোলা প্রচলিত সেটি ২ গ্রাম কমে অর্থাৎ ১০ গ্রামে তোলার হিসাব চলমান। সুতরাং এখনকার তোলা হিসাবে যা ১০ গ্রামে প্রদান করা হয় = ৮ (আট) তোলা ৭ (সাত) গ্রাম এবং ৪৮০মি. গ্রা. হচ্ছে। সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ আর থাকছে না! তারপরও, প্রাচীন ও আধুনিক হিসাব সমন্বয় পূর্বক সোনার নিসাব হল : ৮৭ গ্রাম + ৪৮০ মি. গ্রাম। মনে রাখার সুবিধার্থে এটিকে আমরা ৮৭.৫ বা ৮৮ গ্রামই লিখে দিলাম।

১৫. . জাদীদ ফিকহী মাসাইল : খ-১, পৃ. ২০১-২০২।

১৬. ইবন মাজা, কিতাবুল উদহিয়্যা।

১৭. জাদীদ ফিকহী মাসাইল : খ-১, পৃ. ২০১-২০২।

১৮. যুজাজাতুল মাসাবীহ : ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে উত্তম সনদ সূত্রে বর্ণিত, কুরবানী অধ্যায়।

১৯. সূরা : আল-কাউসার: আয়াত নং-২, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম : কুরবানী অধ্যায়+ তিরমিযী : কুরবানী অধ্যায়।

২০. ইবনে মাজা : যবাই অধ্যায়।

২১. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩০৪।

২২. সহীহ বুখারী : কুরবানী অধ্যায়।

২৩. ফাতাওয়া আলমগীরী : খ-৬, পৃ. ১৯৭।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. সুনানি আবূ দাউদ ও জামে' তিরমিযী : কুরবানী অধ্যায়।

২৬. মুফতী মুহা: আমীমুল ইহসান র. : আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা : পৃ.-৬০, ৬৩, ৯১; আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত।

২৭. ফাতাওয়া আলমগীরী : খ-৬, পৃ. ১৯৭।

২৮. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩১৪।

২৯. ফাতাওয়া আলমগীরী : খ-৬, পৃ. ১৯৬।

৩০. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩১২।

৩১. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩২৮।

৩২. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩২৮।

৩৩. সহীহ মুসলিম: হজ্জ অধ্যায়+সুনানি আবূ দাউদ।

৩৪. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩০৮।

৩৫. মুসলিম শরীফ : কুরবানী অধ্যায়।
৩৬. মুসলিম ও আবূ দাউদ।
৩৭. মুসলিম শরীফ : কুরবানী অধ্যায়।
৩৮. নাসাঈ শরীফ : কুরবানী অধ্যায় +ইবন মাজা : কুরবানী অধ্যায়।
৩৯. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩১০।
৪০. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩১৬।
৪১. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩১৬।
৪২. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩১৫।
৪৩. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩১৫।
৪৪. শারহুত তানভীর : প্রাগুক্ত।
৪৫. মুসলিম শরীফ : কুরবানী অধ্যায়।
৪৬. ফাতাওয়া আলমগীরী : খ-৬, পৃ. ৩০১।
৪৭. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩২১।
৪৮. সুনানি তিরমিযী শরীফ : কুরবানী অধ্যায়।
৪৯. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩১২, ৩১৪ + রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩২৮।
৫০. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩২৮।
৫১. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩২০।
৫২. রাদ্দুল মুহতারঃ খ-৫, পৃ-৩১৫(পুরাতন ছাপা)।
৫৩. রাদ্দুল মুহতার : খ-৫, পৃ. ৩২৮।
৫৪. বায়হাকী শরীফ : ৯/২৯৪, ইত্যাদি।
৫৫. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩২১।
৫৬. শারহুত তানভীর : খ-৫, পৃ. ৩২১।
৫৭. মিশকাতুল মাসাবীহ্ : পৃ. ১২৮, মূল আরবী, মোজতাবাঈ প্রকাশনী, ভারত, তা. বি.।
৫৮. তথ্যসূত্র : আল-বাহরুর রায়িক : খ-৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত; আলমগীরী; রাদ্দুল-মুহতার বা ফাতাওয়া শামী : খ-৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।
৫৯. সূরা হজ: আয়াত নং ২৮।
৬০. সহীহ মুসলিম: কুরবানী অধ্যায়, মূল আরবী।
৬১. তিরমিযী শরীফ: কুরবানী অধ্যায়, মূল আরবী।
৬২. জামে' তিরমিযী শরীফ: হাদীস নং ১৪৫৩, পৃ. ৪৮৯, মীনা বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, সং-জানুয়ারী-২০১০খ্রি.।
৬৩. শারহুত তানভীর: খ. ৫, পৃ. ৩২০।
৬৪. ফাতাওয়া আলমগীরী: খ. ৬, পৃ. ৩০১।
৬৫. প্রাগুক্ত।
৬৬. প্রাগুক্ত: পৃ. ৩১২ + রাদ্দুল মুহতার: খ. ৫, পৃ. ৩২৮।
৬৭. উসূলি-ইফতা ও কাওয়াইদে ইফতার সব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

লেখক : মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

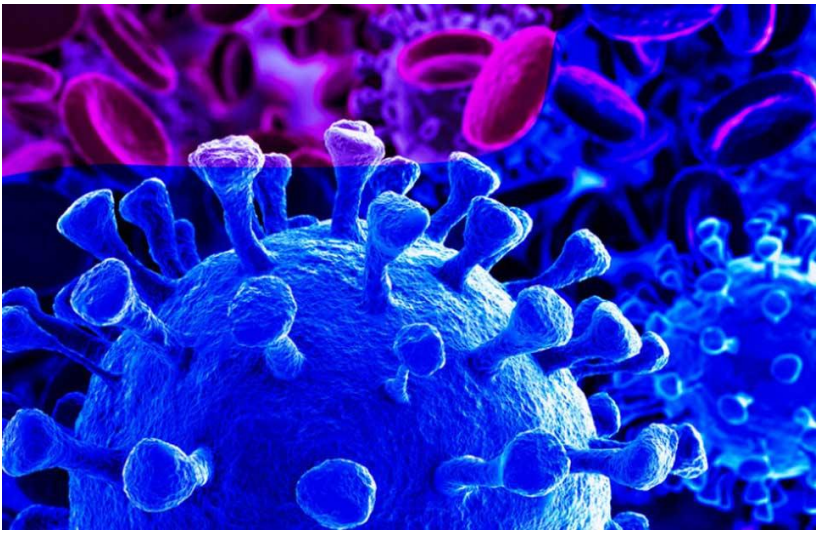

প্রসঙ্গ কোভিড-১৯

মহানবী (সা)-এর আপৎকালীন নির্দেশনা

মুস্তাফা মাসুদ

সমগ্র পৃথিবী আজ করোনাভাইরাস-সৃষ্ট কোভিড-১৯ নামক এক প্রাণঘাতী রোগে পর্যুদস্ত। সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত প্রায় অর্ধকোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ রোগে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শীর্ষে অবস্থানকারী উন্নত দেশগুলোও এর ছোবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। চীনের উহান শহরে উৎপত্তিলাভকারী বলে কথিত এই রোগটি প্রায় দুটি বছর ধরে আধুনিক মানুষের সমস্ত গর্ব আর অহংকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়ে তার অপ্রতিহত গতি এখনো অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে।

আল্লাহ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানুষ তাদের সমস্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কোভিড-১৯ কে ঠেকানোর জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছিল রোগের সূচনার অব্যবহিত পর থেকেই। বেশকিছুদিন আগে তার ফলও পাওয়া গেছে; অবিষ্কার হয়েছে করোনাভাইরাস-প্রতিরোধী বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিন– ফাইজারের মডার্না, অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রাজেনেকা, সিনোফার্মের সিনোভ্যাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেশে দেশে এসব ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে বেশ ক'মাস আগে থেকেই। এসব ভ্যাকসিনের কোনোটারই শতভাগ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকলেও রোগের সংক্রমণ কমাতে এগুলো যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব এখন বেশ নিয়ন্ত্রণের দিকে। আশা করা যায়, অদূরভবিষ্যতে তা পূর্ণনিয়ন্ত্রণে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কোভিড-১৯ নামক মহামারি নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগে থেকেই, অর্থাৎ রোগের সূচনার পর থেকেই আমরা বেশকিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছি, যেমন: মুখে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, সাবান পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়া, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকা, টাটকা ফলমূল খাওয়া ইত্যাদি। আজ আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করি– আমরা এই একবিংশ শতাব্দীতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, প্রায় দেড়হাজার বছর আগে মহানবী (সা)-এর যুগেও সংক্রামক রোগব্যাধি ও মহামারি নিয়ন্ত্রণে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হতো। তখন আজকের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহুমুখী ও ব্যাপক-সম্প্রসারিত উৎকর্ষ সাধিত না-হলেও সমকালীন প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিকিৎসাবিধান, যা তিব্বে নববী নামে অভিহিত, রোগব্যাধি ও মহামারি নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি তথাকথিত চিকিৎসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল, ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুহৃদ পথপ্রদর্শক– নির্ভুল দিশারী। ইহকালীন জীবনে তাঁর উম্মতের জাগতিক বা শারীরবৃত্তীয় সমস্যা তথা রোগব্যাধির ব্যাপারেও তাই সচেতন ছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন: 'তোমরা চিকিৎসা-ব্যবস্থা গ্রহণ করো। কেননা, আল্লাহ কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি তার প্রতিকার ব্যতীত; শুধু একটি রোগের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যতিক্রম, যার নাম বার্ধক্য। [ইমাম আবু দাউদ সংকলিত *সুনানে আবু দাউদ।*] ইমাম তিরমিযী সংকলিত

সহীহ হাদিসগ্রন্থ তিরমিযী শরিফের একটি হাদিসে নবী করীম (সা) বলেছেন: হে আল্লাহর বান্দা, ওষুধ ব্যবহার করো; কারণ, আল্লাহ কোনো যাতনা সৃষ্টি করেন না তার আরোগ্যে ব্যবস্থা ব্যতীত। এই হাদিস দুটিতে দেখা যাচ্ছে, মহানবী (সা) রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রোগব্যাধিগ্রস্ত লোকদেরকে নানারকম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আজকের এই করোনাকালে, আসুন, সংক্রামক ব্যাধি তথা ব্যাপক-বিধ্বংসী মহামারি প্রতিরোধে মহানবী (সা) যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন, সেদিকে একটু দৃষ্টিপাত করি এবং সন্তুষ্টি লাভ করি এই ভেবে যে, চিরন্তন কল্যাণের ধর্ম ইসলামের নবী (সা) সর্বাবস্থায়ই আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন এবং কল্যাণের-মঙ্গলের পথ বাত্লে দিয়েছেন। তাঁর সময়ের সংকটকালে তিনি যেসব পন্থা গ্রহণের কথা বলেছেন, আজকের করোনার মহামারিকালেও তা সমান প্রাসঙ্গিক এবং অনুসরণীয়, পালনীয়। এ বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

১. ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন

এ দুটি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আজকের করোনা মহামারিকালে একান্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। রোগের বিস্তার কমানোর জন্য মহানবী (সা) রোগে আক্রান্ত স্থানসমূহে ভ্রমণ নিষিদ্ধ এবং সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: 'যদি তোমরা কোনো অঞ্চলে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কথা শুনতে পাও, তাহলে সেখানে ঢুকবে না; আর যদি সেখানে থাকাকালীন কোনো স্থানে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সেই স্থান ত্যাগ করবে না। [সহীহ আল বুখারি, হাদিস নম্বর: ৫৭৩০ ও সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২২১৯]

বস্তুত, ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা ও কোয়ারেন্টাইন বা সংগনিরোধ ব্যবস্থা সংক্রামক কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তার রোধ ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর পন্থা হিসেবে আজও গৃহীত হয়েছে এবং আশাব্যঞ্জক ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

২. সামাজিক দূররত্ব বজায় রাখা ও বিচ্ছিন্ন থাকা

আপৎকালে মহানবী (সা) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। জানা যায়, একজন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বাইয়াত হতে (আনুগত্যের স্বীকৃতি জানাতে) এসেছিলেন। এটি এমনি একটি পদ্ধতি যে, হাত ছুঁয়ে বা ধরেই বাইয়াত গ্রহণ করতে হয়। অথচ লোকটি ছিলেন কুষ্ঠরোগী, যে-রোগটি ছোঁয়াচে বা সংক্রামক এবং এক মারাত্মক প্রাণঘাতি ব্যাধি। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) কী করলেন? তিনি লোকটির কাছে খবর পাঠালেন যে, তার (কুষ্ঠরোগীর) বাইয়াত ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে এবং তাকে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ্ শরিফে ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

অন্যদিকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রতিও রাসূলুল্লাহ (সা) সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা অসুস্থ তাদের কোনোভাবেই অন্যদের সাথে থাকা উচিত নয়। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: 'অসুস্থ রোগীকে সুস্থ ব্যক্তির সাথে রাখবে না।' [সহীহ আল বুখারি] একই নির্দেশনা পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিলো। এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশনা: 'কোনো রোগে আক্রান্ত গরুকে সুস্থ গরুর সাথে মেশানো উচিত নয়।' [সহীহ আল বুখারি]। বুখারি শরিফের আর একটি হাদিসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন: 'আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।' ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তা গ্রন্থে সংকলিত ১৪৩৫ নম্বর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন: 'কারো ক্ষতি করো না, এবং ক্ষতিগ্রস্তও হয়ো না [লা দারার ওয়া লা দিরার]'। উপরের

দুটি হাদিসে উল্লেখিত 'কষ্ট' এবং 'ক্ষতি'র মর্মার্থ নানারূপ হতে পারে; তারমধ্যে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিবেশী, এমনকি কাছের কারও মধ্যে সেই রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করার বিষয়ও হতে পারে। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন: 'একজন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ মানুষের সাথে মিশবে না।' [মুসলিম শরিফ, ২২২১ নম্বর হাদিস] সহীহ বুখারি শরিফের ৫৭০৭ নম্বর হাদিসে রাসূল (সা) বলেছেন: 'একজন লোক সিংহ দেখলে যেভাবে পালায়, সংক্রামক ব্যাধিকে তোমরা সেভাবে এড়িয়ে চলবে।'

অথচ কোভিড-১৯ মহামারিকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও বিচ্ছিন্ন থাকার এই যে কার্যকর পন্থা, তা গ্রহণের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে অনীহা ও সচেতনতার অভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার নিয়ম পালন করাতে গিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়; জেল-জরিমানার সাজা পর্যন্ত আরোপ করতে হয়। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখুন– রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে মুসলমানেরা ধর্মীয় বিধান হিসেবেই আপৎকালে সামাজিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুশীলন করতেন, মেনে চলতেন।

অতএব একথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি: সংক্রামক রোগের বিস্তার এড়াতে সাবধানতা গ্রহণ জরুরি, এবং এটা ইসলামসম্মত বিধান– রাসূল (সা)-এর হাদিসেই তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ এই সাবধানতারই অংশ। এই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তথা কোভিড-১৯-এর বিস্তার ঠেকানোর জন্যই সরকারকে সময়ে সময়ে লকডাউন আরোপ করতে হয়েছে, অভ্যন্তবীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে বিমান-বাস-ট্রেন-লঞ্চের ওপর ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয়েছে, দোকানপাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয়েছে। আর এর ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে। ব্যাপকহারে ভ্যাকসিন প্রদান, মাস্ক পরিধানসহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতির কারণে আমাদের দেশে করোনার সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হারও এখন নিম্নমুখি। আল্লাহর রহমতে অদূরভবিষ্যতে এই হার শূন্যে নেমে আসবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

৩. স্বাস্থ্যবিধি

মহানবী (সা) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। বস্তুত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যবিধির মূল চাবিকাঠি। এর দুটি দিক আছে– এক. শারীরিক, দুই. অভ্যন্তরীণ বা ক্বালবি। শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অন্তঃকরণ বা ক্বালবকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ রাখা– এই দুয়ের সমন্বয়েই মূলত একজন মুসলমানের স্বাস্থ্যবিধির ভিত্তি রচিত হয়। পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার

ওপর আল্লাহর নবী (সা) কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা বোঝা যায় তাঁর নিজের কথায়। তিনি বলেছেন: 'আত্তুহুরু শাত্রুল ঈমান' অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। গোসল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য ওযু অর্থাৎ বিশেষ নিয়মে দুহাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া, দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধোয়া, মুখমণ্ডল ধোয়া, মুখে পানি কুলি করা ও গলার ভেতরে গড়গড়া করা, নাকে পানি ঢুকিয়ে পরিষ্কার করা, ভিজে আঙুলের অগ্রভাগ কানে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করা, কান ও মাথা মাসেহ করা ইত্যাদি– সবই পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার অনুষঙ্গবিশেষ; এবং এসবই সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্যবিধির আওতাভুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় শরীর যেমন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন আর সতেজ থাকে, তেমনি অন্তঃকরণও হয় পবিত্র-পরিশুদ্ধ আর তাক্ওয়াপূর্ণ। এই ব্যাপকভিত্তিক উপকারিতার কারণেই পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। কারণ, নামাযের প্রথম শর্তই হলো শরীর পাক-পবিত্র থাকা। অপবিত্র বা নাপাক শরীরে নামায হয় না; আর নামায ছাড়া যেমন মু'মিন হওয়া যায় না, তেমনি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভও অসম্পূর্ণ থাকে; তখন ঈমানও হয়ে যায় অপূর্ণাঙ্গ, নাজুক। অন্যদিকে অপবিত্রতার কারণে নামায শুদ্ধ না হলে অন্যান্য ইবাদতও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

আজকের করোনা মহামারির এই বৈরী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অমিয় বাণী– 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক'-এর অপরিসীম গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আজ প্রচার মাধ্যমে সরকার থেকে বারবার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে মাস্ক পরার জন্য, সাবানপানি দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য, পরিষ্কার খোলামেলা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার জন্য, হাঁচি-কাশি রুমাল, টিসু বা কনুই বাঁকা করে জীবাণু ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর জন্য। সুনানে তিরমিযী

শরীফের এক হাদিস থেকে জানা যায়– মহানবী (সা) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং হাঁচি বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দিতেন না; কারণ, তা বায়ুবাহিত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধারণ করে। মোটকথা, মুসলমানদের শেখানো হয় যে, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এর মাধ্যমেই মানুষ অপরিচ্ছন্নতার ঝুঁকি এড়িয়ে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ জীবনের অধিকারী হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২২৩ নম্বর আয়াতাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন বলেছেন: '.. এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের ভালোবাসেন যারা নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখে।'

৪. চিকিৎসা সেবা গ্রহণ

ইসলাম ব্যবহারিক ও প্রগতিশীল দৃঢ় ঈমানভিত্তিক এক সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সা) সেভাবেই তাঁর উম্মতদেরকে পরিচালিত করেছেন, নিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্যই কেউ অসুস্থ হলে তিনি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও করুণা প্রার্থনার পাশাপশি চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ শরিফের এক হাদিস থেকে জানা যায়, একবার একদল মরুচারী বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, তারা যদি অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসা গ্রহণ না করে তাহলে তা কী পাপ বলে গণ্য হবে? তিনি উত্তর দেন: 'চিকিৎসা গ্রহণ করো, হে আল্লাহর বান্দা! কারণ, আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিকারের বিধানও তিনি দেননি– কেবল বার্ধক্য ব্যতীত।' রাসূল (সা) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা সহায়তা চাওয়া সফল চিকিৎসার চাবিকাঠি। তাঁর ভাষায়: 'প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে। রোগের যদি প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশেই তা নিরাময় হয়।' [সহীহ মুসলিম]

আজকের করোনাকালে একশ্রেণির মানুষকে ভ্যাকসিন নিতে অনীহ দেখা যায়; মাস্ক পরতেও তারা আগ্রহী নয়। তাদের যুক্তি আল্লাহ ভরসা; তিনি যা করেন তাই হবে। রাসূল (সা)-ও কী তা জানতেন না? আমরাও কী জানি না? তাহলে কেন রাসূলুল্লাহ (সা) বেদুইনদেরকে বলেছিলেন চিকিৎসকের কাছে যেতে? কেন তিনি চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন? উৎসাহিত করেছেন? আসলে বিষয়টা এই, যা সহীহ মুসলিম শরিফে সংকলিত ওপরের হাদিসে স্পষ্ট বিবৃত: 'প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে। রোগের যদি প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশেই তা নিরাময় হয়।' এতে বোঝা যায়– চিকিৎসা নিতে হবে, পাশাপাশি আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসাও করতে হবে। অন্য একটি হাদিসে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন: 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা)

করো, কিন্তু উটটি বেঁধে রাখতে ভুল করো না।' সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়– ইসলাম অসহায় চাতকের মতো জমিনে নিশ্চেষ্ট বসে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে পানি পানি করে চীৎকারের ধর্ম নয়; আল্লাহর উপর ফলাফলের জন্য ভরসা করে যথাযথ চেষ্টা করতে হবে; আপৎকালে তার প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়ে সম্ভাব্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই ভালো কিছুর আশা করা যেতে পারে। ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা। সেই বাস্তবতা হলো– আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং কর্মপ্রচেষ্টা তথা আত্মরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ। পবিত্র কুরআনেও এই নীতির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই: 'লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা'আ' অর্থাৎ– চেষ্টা ব্যতীত মানুষ কিছু পায় না। [আল কুরআন, সূরা: নাজ্‌ম, আযাত: ৩৯] তাহলে করোনা প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া, ভ্যাকসিন বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ যে পুরোপুরি রাসূল (সা)-এর সুন্নাহসম্মত তথা ইসলামসম্মত, তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই; বরং এর বিপরীতটাই হবে নবী করীম (সা)-এর সুন্নাহ ও নির্দেশনা তথা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থি।

৫. বিনামূল্যে সেবা

আজকের করোনাকালে করোনার প্রধান প্রতিষেধক ভ্যাকসিন জনগণকে বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এটি না হলে জনগণ ভয়ানক স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে পড়ে যেত। সরকার কর্তৃক ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন, জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নানারূপ শাস্তি আরোপ– এসবও সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের জন্য ফ্রি-সার্ভিস। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা প্রদান এবং অন্যান্য সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনার ব্যবস্থাও আপৎকালে সরকার করছে। অনুরূপ ব্যবস্থা ইসলামের প্রথম যুগেও গ্রহণ করা হতো। মহানবী (সা)-এর সময়ই বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার-ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সময় তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিলো। আপৎকালে, অভাবের সময় বা দুর্ভিক্ষকালে বায়তুল মাল থেকে দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, এতিম, বিধবা এবং অন্য সংকটগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে জনগণের কাছে সরকার দায়বদ্ধ থাকতো। জানা যায়, হযরত উমর (রা) একবার সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন। তখন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত একদল খ্রিষ্টানের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সব অবগত হয়ে খলিফাতুল মুসলেমিন তৎক্ষণাৎ সরকারি কোষাগার থেকে তাদের চিকিৎসা ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেন, যাতে এই ব্যাধিগ্রস্ত লোকগুলো চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি বন্দিদের ওপর সযত্ন

নজর রাখার এবং অসুস্থ বন্দিদের চিকিৎসায় প্রয়োজনী সব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিতেন।

আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত, তাঁর আদর্শের অনুসারী– মুসলিম; এক পরিপূর্ণ, ঈমানমুখি, তাকওয়াপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি জীবনব্যবস্থার ধারক, উত্তরাধিকারী ও মান্যকারী। সেই জীবনব্যবস্থায় যেসব বিধান-নির্দেশনা রয়েছে, তা আমাদের জন্য অশেষ কল্যাণকর– ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে। প্রতি ওয়াক্ত নামায-শেষে আমার দুহাত তুলে মুনাজাত করি: 'রব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার' [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১] এখানে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়েছে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাওয়া হয়েছে। আর পারলৌকিক সর্বোত্তম, কল্যাণময়, সুন্দর অনন্ত জীবনের জন্য ইহলৌকিক জীবনকে সুন্দর, পবিত্র, পরিপাটি, তাকওয়াপূর্ণ ও নিঃশর্ত ঈমানমুখি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য; তাহলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এবং পরকালীন জীবনে নাজাতের আশা করা যায়।

করোনার এই সংকট আমাদের শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দীনী বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্যের অংশ হিসেবেই আমাদেরকে করোনা মুকাবিলায় অগ্রণী হতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সংক্রামক রোগ ও মহামারি প্রতিরোধে, নিয়ন্ত্রণে যেসব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা একরৈখিক নয়; দ্বিরৈখিক। দৈহিক বা শারীরিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি তিনি অন্তঃকরণের পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং এই উভয়বিধ পরিচ্ছন্নতাই পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। আজকের দিনে আমাদেরকেও এই পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতার সামগ্রিক রূপকে ধারণ করতে হবে। আমরা দৈহিক পবিত্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি ক্বলবি পরিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রাখব এবং এই সংকটকালে বাহ্যিক সাবধানতাসমূহ অবলম্বনের পাশাপাশি এই মুসিবত থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর রহমত ও সাহায্য প্রার্থনা করব– এই হোক আমাদের আজকের দিনের অঙ্গীকার। আর তাহলেই আমরা যাবতীয় বালামুসিবত থেকে দূরে থাকতে পারব এবং আমাদের জীবন হবে সুন্দর, নিরাপদ ও সফলতাময়, ইনশাআল্লাহ।♦

ই | মা | ম |

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ ইসলামি ফকিহ্, গবেষক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আলেম। মহাবিশ্বে যে সকল মহামনীষী ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করে, ইসলামকে অনুসরণের জন্য সাধারণের নিকট সহজসাধ্য করে তুলেছেন তাদের মধ্য তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি তার গোটা জীবন কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর নিখাঁদ ও নির্যাস বের করে, উম্মতে মুহাম্মদীদের নিকট পৌঁছে দিতে উৎসর্গ করেছেন। কুরআন ও হাদিসের

গবেষণা যাকে আমরা ইজতিহাদ বলে থাকি, এ ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সহিহ সঠিক গবেষণা এতই খ্যাতি অর্জন করে যে তাকে সমকালীন যুগে ফকীহদের সর্দার বলা হতো।

জন্ম ও জন্মস্থান

সকল ঐতিহাসিকের মতে ইমাম শাফেয়ী (র) ১৫০ হিজরি সনে (খৃষ্টাব্দে) মিসরের আসকালনা প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, যে বছর ইমাম আবূ হানীফা (র) ইন্তেকাল করেন। তিনি জন্মের দুবছর পর তাঁর পিতা মারা যান। ইমামের জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু মতামত পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন গাযা নামক স্থানে, মানাকিব (বায়হাকী, ২/৭১ পৃ.)। কেউ বলেন আসকালান শহরে, আবার কেউ বলেন ইয়ামান দেশে। (আদাবুশ্ শাফেয়ী পৃ. ২১, ২২, ২৩)

এ মতবিরোধের সমাধানে ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, গাযা ও আসকালান এ দু'টি পাশাপাশি এলাকা, মূলত আসকালান প্রসিদ্ধ নগরী এরই অন্তর্গত (তৎকালীন) একটি এলাকা/গ্রাম গাযা সেখানেই ইমাম শাফেয়ী জন্মলাভ করেন। তাঁর মা ছিলেন ইয়ামানের প্রসিদ্ধ 'আয্দিয়্যাহ' গোত্রের, তাই জন্মের দু'বছর পর ছেলে ইয়াতীম হয়ে যাওয়ায় মা ছেলেকে নিয়ে পিতৃকূল ইয়ামানে চলে যান। কয়েক বছর পরেই ইমামের বাবার বংশ কুরাইশ বংশের সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে আবার মক্কায় পাড়ি জমান। অতএব ইমাম শাফেয়ীর জন্মস্থান সম্পর্কে আর কোন মতভেদ থাকে না। (তাওয়াল্লী তাসীস- পৃ. ৫১, ৫২)

বংশ পরিচয়

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর পুরো নাম মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফেয়ী, আল কুরাশী, আল শাফেয়ী, আল মাক্কী। এ হিসাবে তাঁর নাম-মুহাম্মদ, পিতার নাম-ইদ্রিস, দাদার নাম-আববাস। তাঁর উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ্। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে তাঁর নবম পূর্বপুরুষ আবদুল মান্নাফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এর চতুর্থ পূর্বপুরুষ ছিলেন। ইমাম সাহেবের ৫ম প্রপিতামহ সায়িব বদরের যুদ্ধে শত্রু পক্ষে অবস্থান করলেও পরবর্তীকালে তিনি ও তাঁর ছেলে শাফেয়ী সাহাবী হবার মর্যাদা লাভ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বংশ- কুরাইশ বংশের অন্যতম 'আব্দে মান্নাফ বিন কুসাই' এর কাছে মিলিত হয়েছে, তাই ইমাম শাফেয়ীর বংশের মূল এবং রাসূল (সা)-এর বংশ একই। এ জন্য তিনি আল-মুত্তালাবী বলে পরিচিত, তিনি কুরাইশ বংশের তাই কুরাশী এবং তাঁর দাদা 'শাফে' সাহাবী এর দিকে সম্পৃক্ত করায় শাফেয়ী, মক্কায় প্রতিপালিত হওয়ায় মাক্কী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

(আল ইসাবাহ, ২/১১ পৃ., তাওয়াল্লী তাসীস, ৩৭ পৃ., তারীখে বাগদাদ, ২/৫৮ পৃ.)।

তাঁর মাতা ছিলেন ইমাম হাসান (রা)-এর বংশধর। তাঁর মাতা বংশ পরম্পরা ছিলেন, উম্মুল হাসান বিনতে হামযা ইবনে কাসেম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে হাসান (রা)। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উপাধি হল, 'নাসিরুল হাদীস' হাদীসের সাহায্যকারী বা সহায়ক, কারণ হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, বিশেষ করে হাদীসের যাচাই-বাছাইয়ে তিনি সর্বপ্রথম অবদান রাখেন, তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা প্রণয়নে কলম ধরেন 'আর রিসালাহ ও আল উম্ম' গ্রন্থদ্বয়ে। অতঃপর সে পথ ধরেই পরবর্তী ইমামগণ অগ্রসর হন। (মানাকিব বাইহাকী, ১/৪৭২ পৃঃ, তাওয়াল্লী তাসীস, ৪০ পৃ., তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস, ১০ পৃ.)

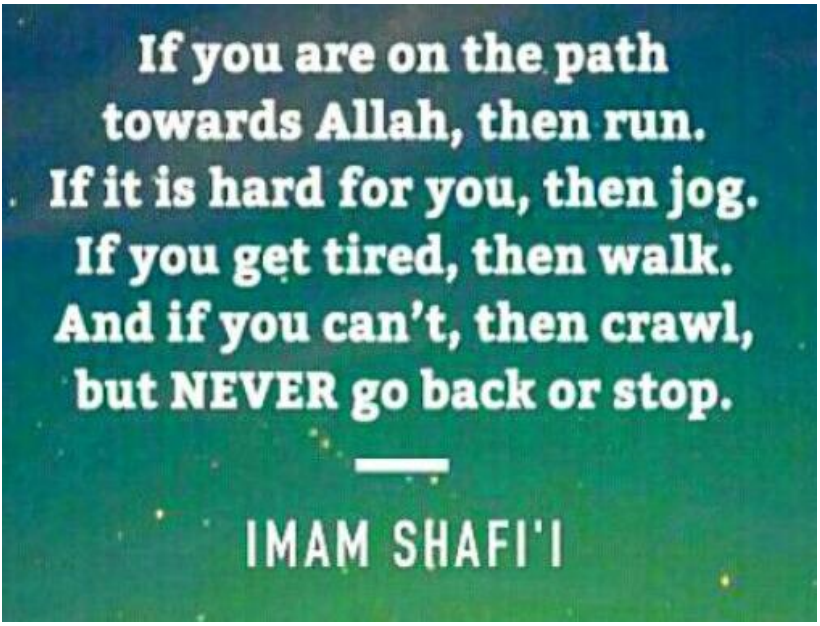

বাল্যকাল

ইমাম শাফেয়ী (র) ছোট কালেই পিতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীনতা ও দারিদ্রতা ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। পিতা মারা গেলে বিচক্ষণ মা তাকে দু'বছর বয়সে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিয়ে আসলে তিনি কুরআন মুখস্থ করায় মনোনিবেশ হন এবং সাত বছর বয়সেই সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন। (মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ, ১/২৩)

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মা ছিলেন একজন সৎ ও ধার্মিক নারী। সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য সারা দেশে তাঁর নাম ছিল। এই বিদূষী নারীকে দেশের লোক যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনি বিশ্বাসও করতেন। অনেকে তাঁর কাছে আমানত রাখতেন। একবার দুইজন লোক কাপড় ভর্তি একটা বাক্স রাখলেন। কিছু দিন পর একজন লোক তা নিয়েও গেলেন। কিন্তু কিছু দিন পর অন্যজন আবার বাক্স চাইলেন। তাকে বলা হল বাক্সটি তার সাথী নিয়ে গেছেন। তারপর লোকটি বলল, আমরা দু-জন যে জিনিস রাখলাম তা আপনি একজনকে দিলেন কিভাবে? বলা বাহুল্য ইমাম শাফেয়ীর (র) মা খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর লজ্জার সীমা রইল না। ইমাম শাফেয়ী (র) তখন পুরো ঘটনাটা শুনলেন। তারপর এক মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন। তারপর লোকটিকে বললেন, 'কিন্তু আপনিই বা বাক্স নিতে একা এলেন কেন? আপনার সঙ্গীকেও আনতে হবে'। তাঁর কথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে গেলেন এবং নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেলেন।

তিনি নিজেই বলেন– আমি যখন মায়ের কাছে ইয়াতীম অসহায়, শিক্ষক দেয়ার মত মায়ের কাছে কিছু নেই এমতাবস্থায় শিক্ষক এর স্থলাভিষিক্তে দায়িত্ব পালনশর্তে পড়াতে রাযি হলে আমি তার কাছে কুরআন মুখস্থ খতম করলাম। অতঃপর মাসজিদে বিভিন্ন আলিমদের কাছে বসে হাদীস ও মাসআলা মুখস্ত করতে লাগলাম এবং কিছু বিষয় হাড়ের টুকরায় লিখে রাখতাম। (তাওয়াল্লী তাসীস পৃ. ৫৪)

তিনি আরো বলেন, আমার বয়স যখন প্রায় দশ বছর তখন মক্কায় জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত থাকা দেখে আমার এক আত্মীয় আমাকে বললেন : তুমি একাজ কর না বরং অর্থ উপার্জনের পথ ধর। তিনি বলেন আমি তার কথায় কান দিলাম না বরং শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় আমি আরো মগ্ন হলাম ফলে আল্লাহ আমাকে এসব জ্ঞান দান করেছেন। (তাওয়াল্লী তাসীস পৃ. ৫৩)

তিনি ছোট কাল হতে শিক্ষানুরাগী এবং কঠোর জ্ঞান সাধনার ফলে সাত বছরে কুরআনের হাফেয এবং দশ বছরে মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থ হিফয করে পনের বা আঠার বছর বয়সে ফাতাওয়া প্রদান শুরু করেন। সাথে সাথে মক্কায় আরবী পণ্ডিতদের কাছে আরবী কবিতা ও ভাষা জ্ঞানে পূর্ণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৬৩)

সংক্ষেপে কর্মজীবন

তিনি দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন ও মুয়াত্তা মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় মুসলিম আল-জানজী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তারপর মদিনায় গিয়ে ইমাম মালেক (র)-এর নিকট

ইলমুল ফিক্হ ও মুয়াত্তা শিক্ষা করেন। ১৭৯ হিজরিতে ইমাম মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম শাফি'ই তাঁর তত্ত্বাবধানেই থেকে যান। তারপর তিনি ইয়েমেনে গিয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন।

১৮৯ হিজরিতে তাঁর বিরুদ্ধে শী'আহ বিশ্বাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ার অভিযোগ দেওয়া হয়। তখন তাঁকে ইয়েমেন থেকে গ্রেফতার করে ইরাকে 'আব্বাসি খলীফা হারুন অর রশীদের (শাসনকাল ১৭০-১৯৩ হিজরি) কাছে হাজির করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর আকীদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সেখান থেকে তিনি ইয়ামান চলে যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। এখান থেকে তিনি ইরাক চলে এলে সেখানে প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসানের সাক্ষাত পান এবং তাঁর সাথে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। ১৯৮ হিজরী সালে তিনি মিসর গমন করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম শাফেয়ী (র) স্বীয় যুগে বিভিন্ন দেশে অগণিত আলিম হতে শিক্ষালাভ করেন, ইমাম বায়হাকী, ইবনে কাছীর, মিয্যী, মুযানী ও ইবনু হাজার আসকালান স্বীয় গ্রন্থসমূহে ইমামের শিক্ষক বৃন্দের বিস্তারিত অলোচনা করেছেন তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল– (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৬৩)

(১) ইমাম সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (র) (মৃত: ১৯৮ হি.) (মাক্কী)।
(২) ইমাম ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ (র) (মৃত: ১৭০ হি.) (মাক্কী)।
(৩) ইমাম মুসলিম বিন খালিদ (র) (মৃত: ১৭৯ হি.) (মাক্কী)।
(৪) ইমাম মালিক বিন আনাস (র) (মৃত: ১৭৯ হি.) (মাদানী)।
(৫) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল (র) (মৃত: ২০০ হি) (মাদানী)।
(৬) ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ (র) (মৃত ১৯৭ হি) (ইয়ামানী)।
(৭) ইমাম ওয়াকী বিন আল জাররাহ্ (র) (মৃত ১৯৭ হি) (কুফী)।
এ ছাড়াও আরো অসংখ্য বিদ্বান ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষক ছিলেন।

শিক্ষা সফর

মহামনীষী জ্ঞানপিপাসু ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এক ব্যক্তি বা অঞ্চল হতে জ্ঞান শিক্ষা করে পিপাসা নিবারণ হয়নি, তাই তিনি এক ব্যক্তি হতে আরেক ব্যক্তি এবং এক অঞ্চল হতে আরেক অঞ্চলে জ্ঞানারোহণে ভ্রমণ করেছেন, সাথে সাথে দ্বীন ও জ্ঞান প্রচার ও প্রসারেরও কোন কমতি হয়নি।

মদীনা সফর : সর্বপ্রথম তিনি মদীনা সফর করেন এবং মদীনার ইমাম, ইমাম মালিকের সংকলিত গ্রন্থ মুয়াত্তা মুখস্থ করে তাঁকে শুনান, ইমাম শাফেয়ীর

ছোট বয়সে এই প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দেখে তিনি অভিভূত হন। ইমাম মালিক (র) যত দিন বেঁচে ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (র) ততদিন তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি, তাই মুয়াত্তা ছাড়াও আরো অনেক কিছু তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। (তাওয়াল্লী তাসীস পৃ. ৫৪)

মদীনার পর তিনি ইয়ামানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। জনসমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি বিদ্বেষিদের চক্রান্তে পড়েন, ফলে তিনি ইয়ামান ত্যাগ করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। (মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফিল আকীদা, ১/২৯ পৃঃ)

ইরাক সফর : ইমাম শাফেয়ী (র) ইরাকে দু'বার সফর করেন, প্রথমবার রাজনৈতিক কারণে খলিফা হারুনুর রশীদ তাঁকে ইরাকে জোরপূর্বক পাঠান, যেভাবেই হোক, সেখানে গিয়ে তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ জ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা সমাপন করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং পূর্ণদমে দরস-তাদরীস ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে একটানা নয় বছর আত্মনিয়োগ করেন। (মানহাজুল ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ্- ১/৪৩ পৃঃ)

অতঃপর ১৯৫ হি. ইমাম শাফেয়ী (র) আবারো ইরাক সফর করেন, তবে এ সফর পূর্বের ইরাক সফর হতে অনেক ভিন্ন ছিল। প্রথম সফর ছিল জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের আর এ সফর হলো শিক্ষা গ্রহণ পাশাপাশি শিক্ষাদানের জন্য। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় সনদে আবূ ছাওর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ইমাম শাফেয়ী (র) ইরাকে আসলেন তখন রায়পন্থী (আহলুর রায়) হুসাইন কারাবিসী আমার কাছে আসলেন এবং বললেন যে, আমাদের মাঝে একজন হাদীস পন্থী (আহলে হাদীস) এসেছেন চল আমরা তার কাছে গিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করি।

আবূ ছাওর বলেন : আমরা তাঁর কাছে গেলাম, হুসাইন ইমামকে এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, জবাবে ইমাম সাহেব 'আল্লাহ তা'আলা বলেন এবং রাসূল (সা) বলেন' এভাবে প্রচুর কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে জবাব দিতে থাকলেন এভাবে রাত হয়ে গেল, তখন আমরা তাঁর কুরআন ও হাদীসের অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে আশ্চর্য হলাম, শেষটায় আমাদের রায় ও কিয়াসের বিদ'আত বর্জন করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলাম (মানাকিব বাইহাকী- ১/২২০ পৃ.)। এ সফরেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) ইমাম শাফেয়ীর সাক্ষাৎ করেন।

মিসর দেশে সফর : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ইরাকে অবস্থান যেমনি প্রশংসনীয়, তেমনি আবার অপরদিক হতে কালো মেঘ নেমে আসতে লাগল। মুতাযিলা আলিমরা রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ দখল করায় খলিফা হারুনসহ সে সময়ের

আববাসীয় খলিফাগণ ফালসাফা ও তর্কবিদ্যা-মানতিকে প্রভাবিত হয়ে কুরআন মাখ্লুক (সৃষ্ট) ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম-ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেয়ী এবং যারা বিদ'আত মুক্ত সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসের ধারক-বাহক তাদের উপর নির্যাতন শুরু করে, যার ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম শাফেয়ী ইরাক ত্যাগ করে মিসরে পাড়ি জমান। (মানাকিব বাইহাকী, ১/৪৬৩-৪৬৫)

মিসরে আগমন করলেই মিসরবাসী সানন্দে স্বাগতম জানান, মিসরের বড় মসজিদ– আমর বিন আল আস মসজিদে কিছু আলোচনা পেশ করলে সকলেই তাঁর আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে যান, এবং তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, মিসরের বুকে এমন প্রতিভাবান ব্যক্তির কখনও আগমন ঘটেনি, যিনি কুরাইশ বংশোদ্ভুত, যার সালাতের ন্যায় উত্তম সালাত আদায় করতে কাউকে দেখিনি, যার চেহারার ন্যায় সুন্দর চেহারা খুব কমই আছে, যার বক্তব্য ও বাচন ভঙ্গির মত আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর কাউকে দেখিনি। (মানাকিব বাইহাকী, ২/২৮৪)

তাঁর হাদীস গবেষণা ও চর্চায় যারা হানাফী বা মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তার অনেকেই হাদীসের আলোকে ইসলাম চর্চার সুযোগ লাভে ধন্য হন। ইমাম শাফেয়ী জীবনের শেষ পর্যন্ত মিসরেই অবস্থান করেন এবং তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সেখানেই সংকলন করেন। (মানাকিব বাইহাকী, ২/২৯১)

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ছাত্র হওয়ার যারা সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের সংখ্যা ও বর্ণনা দেয়া অসম্ভব, কারণ তিনি যে দেশেই ভ্রমণ করেছেন এবং শিক্ষার আসরে বসেছেন সেখানেই অগণিত ছাত্র তৈরি হয়েছে। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হল–

(১) ইমাম রাবী বিন সুলায়মান আল মাসরী।

(২) ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল মুযানী আল মাসরী।

(৩) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ আলফাকীহ আল মাসরী।

(৪) ইমাম আবূ ইয়াকূব ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া আল মাসরী।

(৫) ইমাম আবুল হাসান বিন মুহাম্মদ আয্যাফরানী।

এ ছাড়া অগণিত, অসংখ্য ছাত্র রয়েছে যাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। (মানাকিব বাইহাকী, ২/৩২৪)

ইমাম শাফেয়ীর প্রশংসায় উলামায়ে ইসলাম

সত্যকে সত্য বলাই হলো ন্যায় বিচার, ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আল্লাহ ভীরুতা ও সত্যের দাওয়াতের যথার্থতা বর্ণনায় কেউ কম করেননি, যারা ন্যায়কে ন্যায় বলেছেন তন্মধ্যে–

(১) ইমামুল মাদীনাহ ইমাম মালিক (র) বলেন, 'আমি এ যুবক (ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত অধিক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আর কোন কুরাইশীকে পাইনি।' (তাওয়াল্লী তাসীস, ৭৪)

(২) ইমাম আবূল হাসান আয্যাফরানী (র) বলেন, 'আমি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ন্যায় অধিক সম্মানী, মর্যাদাশীল, দানশীল, আল্লাহ ভীরু দ্বীনদার ও অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।' (তাওয়াল্লী তাসীস, ৮০)

(৩) ইমাম ইসহাক বিন রাহ্উয়াহ (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (র) সহ মক্কায় ইমাম শাফেয়ী (র)-এর কাছে গেলাম, তাঁকে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা করলাম তিনি খুব ভদ্রতার সাথে সাবলীল ভাষায় প্রশ্নের জবাব দিলেন। অতঃপর আমাদের চলে আসার সময় একদল কুরআনের আলিম বললেন, ইমাম শাফেয়ী হলেন স্বীয় যুগে কুরআনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী মানুষ।' ইমাম ইসহাক বলেন, 'আমি যদি তাঁর কুরআনের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আগে অবগত হতাম তাহলে তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য থেকে যেতাম।' (তাওয়াল্লী তাসীস ৯০)

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর শাগরিদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) (মৃত্যু ২৪১ হিজরি) সবসময় নামাযে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর জন্য দুআ করতেন। তার পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর বাবাকে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর জন্যে কেন এতো বেশি বেশি তিনি দোয়া করেন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁর বাবা ইমাম সাহেব জবাবে বলেন, ওহে পুত্র! মানুষের মাঝে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মর্যাদা হলো আকাশে সূর্যের উপস্থিতির মতো। তিনি আত্মার (ব্যাধি) নিরাময়কারী স্বরূপ।

(৪) ইমাম শাফেয়ী (র)-কে এক বস্তুবাদী নাস্তিক বলেছিল, হুযুর! আপনারা কিভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বলেন, বুঝে আসে না। আল্লাহকে কখনো দেখেছেন?

ইমাম শাফেয়ী (র) বললেন, বল কি! তুমি আল্লাহর অস্তিত্ব দেখ না? আমি তো ছোট্ট তুত পাতার মধ্যেই আল্লাহকে দেখতে পাই। লক্ষ্য করে দেখ, এই তুত পাতা যদি মধু পোকা খায় তখন তা মিষ্টি মধু হয়ে বের হয়। যদি রেশম পোকা খায়, তখন তা দামী রেশম হয়ে বের হয়। আবার যদি কোন বকরী খায় তখন তা শক্ত বড়ির মত লেদা হয়ে বের হয়। যে সত্তা এমন মেশিন ফিট করেছেন তিনিই হলেন 'আল্লাহ'।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দান-খয়রাত

ইমাম শাফেয়ীর রহমতুল্লাহি আলাইহি বংশ সূত্রে ও পরিমিত মাত্রায় মহানুভতার হয়েছিলেন। সেসময়ের অনেক বড় বড় দানবীরকেই হারিয়ে গিয়েছিলেন দান-খয়রাতের ব্যাপারে। অথচ তিনি ছিলেন একজন অভাবী ব্যক্তি।

তাঁর জীবনের শুরু থেকে মরণের আগ পর্যন্ত অভাব লেগেই ছিলো। সময় কেটেছে দরিদ্র অবস্থায়। ঘরে ঠিকমতো রান্নাবান্না হতো না।

শৈশবে বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়ে যান। তাঁর ভাষ্যানুযায়ী– বাবা মারা যাবার পর আমরা এতোটাই অসহায় হয়ে পড়লাম যে, আমার মা আমার শিক্ষককে বেতন দিতে পারতেন না। তবে তিনি আমাকে এই শর্তে পড়াতে রাজি হন যে, কখনো তিনি অনুপস্থিত থাকলে আমি পূর্বের সবক ছাত্রদেরকে আবার পড়িয়ে দেবো। ইমাম শাফেয়ী এতোটাই বুদ্ধিমান ছিলেন সাত বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন এবং দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা মালেক মুখস্থ করেন। (সিফাতুল সাফওয়ান খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১৪১)

এতো অভাব থাকার পরও তিনি একরাতের অতিরিক্ত খাবার তিনি কখনো জমিয়ে রাখতেন না। কখনো হাদিয়া তোহফা কিংবা টাকা পয়সা হাতে আসলে কালবিলম্ব না করে তিনি দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দুনিয়ার আসবাব পত্র দানের মাধ্যমে আখেরাতের সুখের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। (তাওয়ালিউত তাসিসা পৃ. ৬৭)

আমর ইবনুল সাঈদ সারজি বলেন, টাকা-পয়সা এবং খাবার দানের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ছিলেন সবার সেরা দানবীর। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাকিম বলেন, ইমাম শাফেয়ীর কাছে কেউ কোন কিছু চাইলে লজ্জায় তার চেহারা লাল হয়ে যেত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে সাধ্য অনুযায়ী দান করতেন। ঘটনাক্রমে তখন তার কাছে কিছু না থাকলে পরবর্তী সময়ে লোক মারফতে পাঠিয়ে দিতেন। (তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত খণ্ড ১- পৃ. ৫৭)

জুবায়ের ইবনে সুলাইমান কুরাইশী বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী বলেন, একবার হুসামা এসে আমাকে বললো আমিরুল মুমিনিন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার জন্য পাঁচ হাজার দিনার হাদিয়া পাঠিয়েছেন। এর পরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে জুবায়ের ইবনে সুলাইমান কুরাইশী বলেন, ইমাম শাফেয়ী পাঁচ হাজার দিনার পাওয়ার পর চুল কাটা বাবদ নাপিতকে দেন পঞ্চাশ দিনার। এরপর দিনারের তলের মুখ খুলে সামনে যাকে পান তাকেই দান করতে থাকেন। যেসব কুরাইশী সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাইকে দান করেন মক্কার পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে দান করেন। এরপর যখন তিনি বাড়ি ফিরে দেখা গেলো তার কাছে একশো দিনারের মত আছে।

রাবি ইবনে সুলাইমান বলেন, আমরা একদিন ইমাম শাফেয়ীর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তার জুতার ফিতা ছিড়ে যায়। আমাদের একজন এগিয়ে এসে তার ছেঁড়া ফিতা মেরামত করে দেয়। তখন তিনি আমায় বলতে

লাগলেন তোমার কাছে আমার খরচের কোন কিছু অবশিষ্ট আছে? আমি বললাম জী আছে। তিনি বলেন কতদিনার? আমি বললাম সাত দিনার। তারপর বলেন, এই সাতদিনার তাকে দিয়ে দাও (তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাহ খন্ড ১ পৃ. ৫৮)।

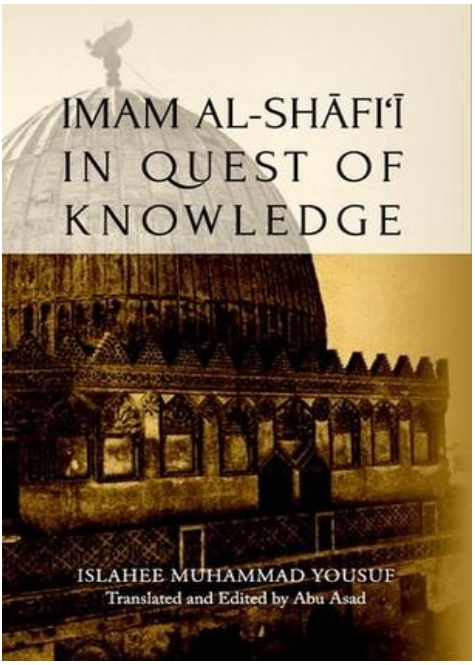

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উপর লেখা গ্রন্থ

আবু সায়ীদ বলেন, ইমাম শাফেয়ী তার সময়কার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানবীর ছিলেন। তিনি একবার একটা পেশাদার দাসি কিনেন। সে দাসি রান্নাবান্নার পাশাপাশি মিষ্টিজাতীয় খাবার তৈরি করতে পারত। একদিন তিনি আমাদের বলেন, তোমরা কে কি খেতে চাও? আমি একটি দাসী কিনেছি তোমরা তোমাদের পছন্দের খাবার কথা বলো। তখন তারা পছন্দের খাবারের কথা বলেন। দাসী যত্নের সঙ্গে সেসব খাবার রান্না করে আমাদের সামনে পরিবেশন করেন। (প্রাগুক্ত খণ্ডঃ ১ পৃ. ৫৮)

একবার ইমাম শাফেয়ী রাবি ইবনে সুলাইমানকে তার খরচের হিসাব খাতায় হিসাব টুকে রাখতে দেখে বলেন, অপ্রয়োজনীয় কাজে খাতার কোন পাতা নষ্ট করো না। আমি কি তোমার থেকে কখনো হিসাব চেয়েছি? রাবী ইবনে সুলাইমান বলেন, আমার স্ত্রী কিছু চাইলে আমি তো এখান থেকে কেনাকাটা করি। আপনার পয়সা খরচ করার অধিকার তো আমার নেই। তিনি

বলেন, হে দীর্ঘ রাতনিদ্রা যাপনকারি! আমার সব অর্থ-সম্পদ তোমার জন্য বৈধ। (তাওয়ালিউত তসিস পৃ. ৬৮)

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর কিছু মূল্যবান উক্তি

(১) হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব (শা'রানী ১/৫৭)।

(২) আমি যে কথাই বলি না কেন অথবা যে নীতিই প্রণয়ন করি না কেন, তা যদি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে বর্ণিত (হাদীসের) খিলাপ হয়, তাহলে সে কথাই মান্য, যা রাসূল (সা) বলেছেন। আর সেটাই আমার কথা।

(৩) নিজ ছাত্র ইমাম আহমাদকে সম্বোধন করে বলেন) হাদীস ও রিজাল সম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে বেশি জানো। অতএব হাদীস সহীহ হলে আমাকে জানাও, সে যাই হোক না কেন; কুকী, বাসরী অথবা শামী। তা সহীহ হলে সেটাই আমি আমার মাযহাব (পন্থা) বানিয়া নেবো।

(৪) আমার পুস্তকে যদি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সুন্নাহের খেলাপের কথা পাও, তাহলে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কথাকেই মেনে নিও এবং আমি যা বলেছি তা বর্জন করো।

(৫) যে কথাই আমি বলি না কেন, তা যদি সহীহ সুন্নাহর পরিপন্থি হয়, তাহলে নবী (সা)-এর হাদীসই অধিক মান্য। সুতরাং তোমরা আমার অন্ধানুকরণ করো না। (হাদীস ও সুন্নাহর মুল্যমান- ৫৪)

(৬) নবী (সা) থেকে যে হাদীসই বর্ণিত হয়, সেটাই আমার কথা; যদিও তা আমার নিকট থেকে না শুনে থাকো। (ইবনু আবী হাতীম ৯৩-৯৪)

৭। চারটি বস্তু দ্বারা শরীর বেশ পরিপুষ্ট হয়–

(ক) গোশত

(খ) সুগন্ধি

(গ) প্রতিদিন গোসল করা

(ঘ) সুতির কাপড় পরিধান করা।

৮। চারটি বস্তু দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ হয়–

(ক) কাবা শরীফ দর্শন করা

(খ) শোয়ার পূর্বে সুরমা ব্যবহার করা

(গ) গাঢ় সবুজ গাছপালার দিকে দৃষ্টিপাত করা

(ঘ) পরিষ্কার জায়গায় বসা।

৯। চারটি অভ্যাস দ্বারা বেশ বুদ্ধি বাড়ে–

(ক) নিরর্থক বাক্যালাপ পরিত্যাগ করা

(খ) নিয়মিত মিসওয়াক করা

(গ) নেক মানুষের সংসর্গে থাকা

(ঘ) আলেমগণের সাথে ওঠাবসা করা।

১০। চারটি অভ্যাস দ্বারা রিজিক বৃদ্ধি পায়–

(ক) নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়া

(খ) বেশি করে তাওবা-ইস্তিগফার করতে থাকা

(গ) বেশি বেশি সদকা করা

(ঘ) বেশি বেশি জিকির করা।

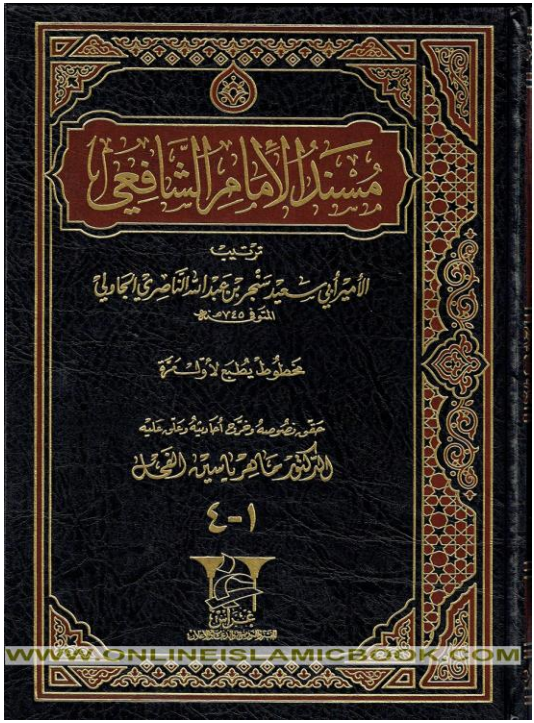

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর গ্রন্থ 'মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী'র প্রচ্ছদ

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর রচিত গ্রন্থাবলি

প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র)-এর গ্রন্থাবলী সর্বাধিক, অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর। ইমাম শাফেয়ী অসংখ্য গ্রন্থ রেখে গেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

(১) 'কিতাবুল উম্ম' মূলত এটি একটি হাদীসের গ্রন্থ, যা ফিকহী পদ্ধতিতে স্বীয় সনদসহ সংকলন করেছেন, এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। যাহা ৯টি বড় খণ্ডে প্রকাশিত।

(২) 'আর রিসালাহ' এটা সেই গ্রন্থ যাতে ইমাম শাফেয়ী উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন।

(৩) আহকামুল কুরআন।

(৪) ইখতিলাফুল হাদীস।

(৫) সিফাতুল আমরি ওয়ান্নাহী।

(৬) জিমাউল ইলম।

(৭) বায়ানুল ফারয।

(৮) ফাযাইলু কুরাইশ।

(৯) ইখতিলাফুল ইরাকিঈন।

(১০) ইখতিলাফু মালিক ওয়া শাফিয়ী। ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থ রয়েছে। (তাওয়াল্লী তাসীস, পৃ. ১৫৪)

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আকীদাহ্-বিশ্বাস

ইমাম শাফেয়ী (র) আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমাম, যিনি ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী, আকীদাহ্-বিশ্বাস, আমল-আখ্লাক, ইবাদাত-বন্দেগী সকল ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতেন এবং আঁকড়ে ধরতেন, তিনি কালাম পন্থী যুক্তিবাদী বিদ'আতীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অনুরূপ রায় ও কিয়াস পন্থীদেরও বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আকীদাহ্-বিশ্বাসই ইমাম শাফেয়ীর আকীদাহ্-বিশ্বাস। এতে কোনই বৈপরিত্য নেই (ইমাম শাফেয়ীর আকীদাহ-বিশ্বাস বিস্তারিত দ্র. মান্হাজ আল ইমাম আশ শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ্)।

ইন্তেকাল

ইমাম শাফেয়ীও আল্লাহর নিয়মের বাইরে নন, একই নিয়মে তিনিও এসেছেন আবার সব কিছু রেখে আল্লাহর আহবানে সারা দিয়ে ২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিন জুমআর রাত্রিতে খলিফা আল মামুনের শাসনকাল ১৯৭-২১৭ হিজরি শাসনামলে ইন্তেকাল করেন এবং পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন। (তাওয়াল্লী তাসীস – ১৭৯)♦

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ

মহিয়ষী নারী বঙ্গমাতা

শেখ ফজিলাতুন্নেছা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। গুলশান আকতার

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী হিসেবে নয়, একজন নীরব দক্ষ সংগঠক হিসেবে যিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে হিমালয় সমআসনে অধিষ্ঠিত করেছেন

তিনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা। শেখ মুজিবের বাঙালি জাতির জনক হয়ে ওঠার পেছনে ফজিলাতুন্নেছার অবদান, অনুপ্রেরণা ও আত্মোৎসর্গ অনস্বীকার্য। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে পেছন থেকে কাজ করেছেন শেখ মুজিবের প্রিয় রেণু।

বেগম মুজিব সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছেন-

> "আমার স্ত্রীর মতো সাহসী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। আমাকে যখন পিন্ডির ফৌজ বা পুলিশ এসে জেলে নিয়ে যায়, আমার উপর নানা অত্যাচার করে, আমি কবে ছাড়া পাব বা কবে ফিরে আসব ঠিক থাকে না, তখন কিন্তু সে কখনো ভেঙে পড়েনি। আমার জীবনের দুটি বৃহৎ অবলম্বন। প্রথমটি হলো আত্মবিশ্বাস, দ্বিতীয়টি হলো আমার স্ত্রী আকৈশোর গৃহিণী।"

মহিয়ষী এই নারী ৮ আগস্ট ১৯৩০ সালের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ জহুরুল হক এবং মাতা হোসনে আরা বেগম। তারা দুই বোন ছিলেন। বড় বোন জিন্নাতুন্নেছা, ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন ছোট। তিন বছর বয়সে বাবা এবং পাঁচ বছর বয়সে মাতাকে হারান। (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ৯৪৪)। শৈশবে বাবা-মাকে হারানোর পর শেখ ফজিলাতুন্নেছা বেড়ে ওঠেন দাদা শেখ কাশেমের নিকটে। মাতৃস্নেহে আগলে রাখেন তার চাচি এবং পরবর্তীতে শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুর মা সায়েরা খাতুন। পিতার অভাব বুঝতে দেননি বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফুর রহমান। তাদের আদরেই বড় হয়ে ওঠেন তিনি। নিজের সন্তানদের সাথে শৈশবে শেখ ফজিলাতুন্নেছাকেও ভর্তি করিয়ে দেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। তবে গৃহে বসে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লিখেছেন,

"রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাতবছর বয়সে মারা যান। তারপর, সে আমার মা'র কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৭)

ফজিলাতুন্নেছার ৩ বছর শেখ মুজিবের ১৩ বছর বয়সে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

'আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার তের বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুইবোনকে লিখে দিয়ে যাব।" রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৭)

ফজিলাতুন্নেছার ছোট বয়সে বিয়ে হলেও বঙ্গবন্ধু এন্ট্রান্স পাস করার পরই মূলত তাদের সংসার জীবন শুরু হয়। ১৯৪২ সালে ফুলশয্যা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

'যদিও আমাদের বিবাহ হয়েছে ছোটবেলায়। ১৯৪২ সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২১)

এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর বয়স ২১ বছর ফজিলাতুন্নেছার বয়স হয়েছিল ১১ বছর। এ বছরই তিনি ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। সেখানেই তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। এই সময়টায় শেখ ফজিলাতুন্নেছা বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে সময় কাটাতেন।

প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের শিক্ষা ছাড়াই ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন সূক্ষ্ম প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত, দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ ও নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন তিনি। আন্দোলনের সময়ও তিনি প্রতিটি ঘটনা জেলখানায় দেখা করার সময় বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করতেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ শুনে তা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের জানিয়ে দিতেন বঙ্গমাতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তো বটেই বঙ্গবন্ধুর পুরো রাজনৈতিক জীবনে ছায়ার মতো পাশে ছিলেন তিনি। সে কারণেই একটি জাতির মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন বপণ করে এর স্বাদও এনে দিতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে পেছন থেকে কাজ করেছেন শেখ মুজিবের প্রিয় সহধর্মীনি ফজিলাতুন্নেছা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে নেপথ্যে থেকে বেগম মুজিব অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক, পারিবারিক

ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন। এই অসামান্য দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী নারী তাঁর দূরদর্শী চিন্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়ে।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে তিনি মুক্তি পান। পরদিন অর্থাৎ ওই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি নিজেদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়ে বরণ করে নেয় বাঙালি জাতি।

প্যারোলে মুক্তি না নেওয়া নিয়ে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের এই সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

৬-দফা ও ১১-দফার আন্দোলনে শেখ ফজিলাতুন্নেছা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন,

> '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দী স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।'

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব রাষ্ট্রীয় প্রটোকলসহ অন্যান্য দায়িত্ব সমভাবে ও অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদন করতেন। দেশ ও জাতির জন্য তার অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাকে 'বঙ্গমাতা' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিল তাঁর সঠিক দিক নির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চের পতাকা উত্তোলনেও বঙ্গবন্ধুর প্রধান উদ্দীপক ও পরামর্শক ছিলেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাস অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য্য নিয়ে শেখ ফজিলাতুন্নেছা পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। এই সময়টায় অনেকটা বন্দিদশায় কেটেছে তাদের। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়। শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার মা সম্পর্কে লিখেছেন,

> 'মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নারী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই রমণী অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেন। জীবনে তাঁর কোন চাহিদা বা মোহ ছিল না। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ৬ দফা আন্দোলনের সময় তিনি নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে সংগঠনের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন। স্বামী শেখ মুজিব ১২

বছর জেলে কাটিয়েছেন। বন্দীকালে ফজিলাতুন্নেছা সংসারের ভার বহন করেছেন। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন; আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। শত শত কর্মীদের খবরাখবর রেখেছেন এবং দুস্থ কর্মীদের সহায়তা করেছেন।' (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ৯৪৫)

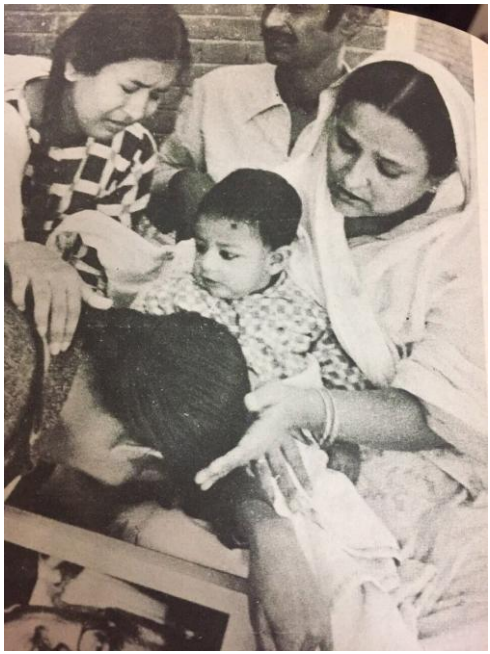

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর সেখান থেকেই লন্ডনে যান। লন্ডন থেকেই বেগম মুজিবের সঙ্গে তাঁর প্রথম কথা হয়। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। অবসান ঘটে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার দীর্ঘ প্রতীক্ষার। এরপর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজেও বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়ান তিনি। অনেক বীরাঙ্গনাকে বিয়ে দিয়ে সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন জীবন দেন। স্বাধীনতার পর বীরাঙ্গনাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গমাতা বলেন,

> "আমি তোমাদের মা।" তিনি বলেন, "এই বীরাঙ্গনা রমণীদের জন্য জাতি গর্বিত। তাদের লজ্জা কিংবা গ্লানিবোধের কোনো কারণ নেই। কেননা তারাই প্রথম প্রমাণ করেছেন যে, কেবল বাংলাদেশের ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও আত্মমর্যাদাবোধে কী

অসম্ভব বলীয়ান।" (দৈনিক বাংলার বাণী, ১৭ ফালগুন, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)

জীবন সংগ্রামের সব কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি পরিবারও সামলেছেন। বঙ্গবন্ধু বারবার গ্রেফতার হয়েছেন, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন কিন্তু বঙ্গমাতা কখনো ভেঙে পড়েননি বরং কারাগারে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর মনোবল দৃঢ় রাখতে সহায়তা করেছেন এবং শক্ত হাতে পরিবারের হাল ধরেছেন। তিনি তাঁর পাঁচ সন্তানকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর অনিন্দ্য আদর্শ ও মূল্যবোধে বড় করেছেন। শেখ হাসিনা বলেন,

> 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যেও বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়শই কারাগারে বন্দী থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারা মুক্তিসহ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।'

জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখার ক্ষেত্রেও মূল প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল তাঁর। শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতেও সহধর্মিণীর সেই অবদানের কথা স্মরণ করে লিখেছেন,

> 'আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, "বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, "লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১)

জীবনসংগ্রামের সব কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে তিনি পরিবারও সামলেছেন বেশ গুছিয়ে। সবকিছুর পরও তিনিই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের রাজনীতির শ্রেষ্ঠ ছায়াসঙ্গী।

সহধর্মিণী হিসেবে নয়, রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে আজীবন প্রিয়তম স্বামী শেখ মুজিবুর রহমানের ছায়াসঙ্গী ছিলেন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। জীবনের

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইতিহাসের কালজয়ী মহানায়ক শেখ মুজিবের অনুপ্রেরণাদায়িনী হয়ে পাশে ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার সঙ্গে তিনিও সপরিবারে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

শক্তিমান রাজনীতিবিদ ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জনাব জিল্লুর রহমান এক ভাষণে বঙ্গভবনে বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরবা, জহরলাল নেহেরুর স্ত্রী কমলা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সাথে তুলনা করতে গিয়ে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে 'বঙ্গমাতা' অভিধায় ভূষিত করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা তাঁর ত্যাগ, সংগ্রামের কারণে মানুষের মাঝে অমর হয়ে আছেন। তিন বঙ্গবন্ধুর প্রেরণা ছিলেন। শেখ ফজিলাতুন্নেছাকে বঙ্গবন্ধুর একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর এবং বাঙালি মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,

> 'তিনি অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, মনোবল, সর্বংসহা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।'

সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ বলেন,

> 'ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সংবেদনশীল মহিলা। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বামীকে উৎসাহ প্রেরণা দেয়া নারীদের সংখ্যা খুব কম। মিসেস ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন এক অনন্য নারী। তাঁর সহযোগিতা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ না হলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো না। ওল্ড টেস্টামেন্টে (Old Testament) বর্ণিত A virtuous women is a crown to her husband একজন পুণ্যবতী রমণী তাঁর স্বামীর মাথার মুকুট। Behind every greatman there is a women প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির পিছনে একজন নারী আছেন। স্ত্রী ফজিলাতুন্নোস ৬ দফা আন্দোলনের সময় দৃঢ়তা, লাহোর গোলটেবিলে বৈঠকে প্যারোলে না যেতে দেয়া, ভুট্টোর সাথে ৬ দফা নিয়ে সমঝোতা না করার জন্য তিনি ছিলেন অনমনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। তাই জাতি তাঁকে বঙ্গজননীর আসনে বসিয়েছেন।' (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, পৃ. ৯৪৮-৯৪৯)

জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গমাতা শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এম.পি বলেন,

> 'বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে বুদ্ধি, সাহস, কৌশল ও উদ্দিপনা দিয়ে তাঁর জীবনে ছায়া সঙ্গী হিসেবে ছিলেন বঙ্গমাতা। নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনকে মসৃণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে হাসিমুখে চিন্তাহীন করে গেছেন বেগম মুজিব।' (মতিয়া চৌধুরী এম.পি, ৮ আগস্ট ২০১৯)

একই সভায় সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক এমপি বলেন,

> "সবাইকে মরতে হবে। জন্ম এবং মৃত্যুর আসা যাওয়ার মধ্যে কিছু মানুষ মারা যাওয়ার পরেও অমর হয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব অন্যতম। তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন, তাঁর সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে।" (রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক এম.পি, ৮ আগস্ট ২০১৯)

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি বলেন,

> 'স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তিনি ছিলেন, আদর্শ মাতা, ভগ্নি। তিনি ছিলেন, শেখ মুজিবের উৎসাহ ও প্রেরণাদায়িনী। তার আদর্শ ও ত্যাগের কারণে জাতি তাকে বঙ্গমাতা উপাধি দিয়েছেন।' (অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এম.পি, ৮ আগস্ট ২০১৯)

বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বেশ কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া পাঁচজন নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পাচ্ছেন 'বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব' পদক। আজ রবিবার এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পদক বিতরণ করবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুটি 'ই-পোস্টার' প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশে ২ হাজার দুস্থ ও অসহায় নারীকে নগদ ২ হাজার টাকা করে মোট ৪০ লাখ টাকা এবং ৪ হাজার সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন,

> 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে

অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতাদান সবই তাকে করতে হয়েছে। বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' (মো. আব্দুল হামিদ, ৮ আগস্ট ২০২১)

প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন,

'জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই কারাগারে বন্দি থাকতেন। এই দুঃসময়ে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন; অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাকে যথার্থই বঙ্গমাতা উপাধিতে ভূষিত করেছে। বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।' (শেখ হাসিনা, ৮ আগস্ট ২০২১)

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ যেমন একই সূত্রে গাঁথা, তেমনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবও পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নাম। বাঙালি জাতি আজন্মকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এই মহিয়সী নারীকে। স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে নেপথ্যের নক্ষত্র হয়ে বঙ্গবন্ধুর পাশেই তিনি জ্বলবেন আপন মহিমায়।

স্মৃতিচিহ্ন

শেখ ফজিলাতুন্নেছার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাঁর নামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও হলের নামকরণ করা হয়। যেমন:

ক. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর।
খ. সরকারি শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়।
গ. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ।
ঘ. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রীবাস, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
ঙ. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল (ছাত্রী হল), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
চ. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল (ছাত্রী হল), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
ছ. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হল (ছাত্রী হল), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান যে মহীয়সী নারীর তিনি তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। আজ আমাদের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তিনি সারা জীবন বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে ছিলেন। সংসারের সকল দায়িত্ব তিনি একাই সামাল দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নিশ্চিন্তে মন দিয়েছে দেশ গড়ার কাজে রাজনীতিতে ও জনসেবায়। এই মহীয়সী নারী ছিলেন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতার একজন যোগ্য সহচর। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখতেন। তাইতো তিনি শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'রেনু নন' আমাদের 'বঙ্গমাতা' ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এর রাতে একাকিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, তুমি ফিরে এসেছো সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। আমি উল্লসিত কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর প্রান্তরে, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ এবং সন্তানহারা জনক-জননী তোমার প্রতীক্ষায়। শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও তিনি নিজ হাতে রান্না করে খাইয়েছেন ভাসানীসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের, যা সম্পূর্ণ ইতিহাস, আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি।♦

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : প্রফেসর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।
ই-মেইল: mahbub.ru2011@gmail.com
গুলশান আকতার : এম.এ থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল: aktergulshan927@gmail.com

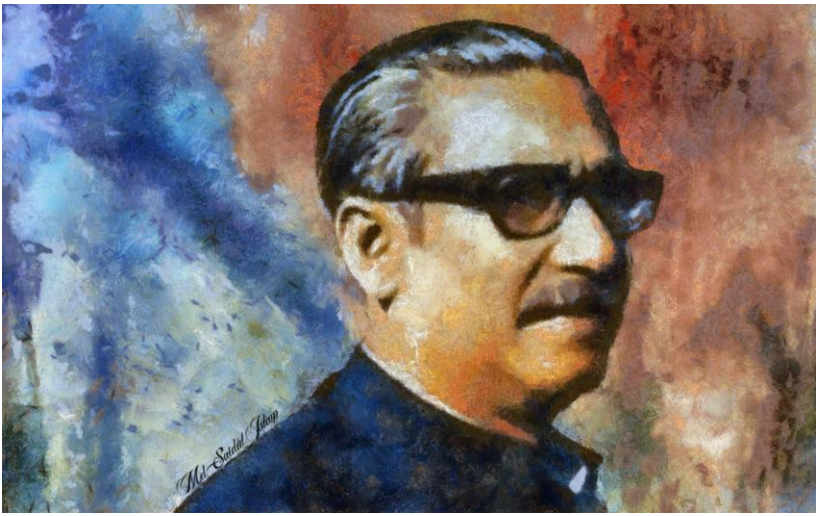

জাতির পিতা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

গোলাম মোহম্মদ আইয়ুব খান

জাতির পিতা কে? কাউকে ইংগিত করে না, একটি অসম্পূর্ণ প্রশ্ন- তবুও প্রশ্ন করেই চলছে। অসম্পূর্ণ প্রশ্নের জবাব যথার্থ হবে তা কোন ভাবেই আশা করা যায় না। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ফরমান, 'নিশ্চই মানুষ তার রবের প্রতি মজ্জাগতভাবে অকৃতজ্ঞ (সূরা আদিয়াতঃ ৬)।' সেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তা আমার কাছে স্রষ্টার বাণীর বিচারে স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার স্বার্থে কোন ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যার বেড়া জালে আবদ্ধ করে সাধারণ মানুষ তথা যুব সমাজের মনে বিষবাষ্প ছড়াবে– তা মেনে নেয়া যায় না। ধর্মের বিচারেও এ যে পাপ।

শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ ত্যাগ, সংগ্রাম ও নেতৃত্বের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে লাল-সবুজের পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। আমরা বাঙ্গালি। এ সূত্র ধরেই শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেমন, বাঙ্গালি জাতির পিতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, Founding Father of Bengali State, Charismatic Leader. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, বঙ্গবন্ধু, বিশ্ববন্ধু ইত্যাদি। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের এলার্জি হলো। অশান্তিতে পুড়ে মরছে। ১৫ই আগষ্ট '৭৫ এর পর শুরু হলো বিভিন্ন উপাধির বিরুদ্ধেও

ষড়যন্ত্র। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের আলোচনায়, রাজনৈতিক মঞ্চে, মাহফিলের মঞ্চে এমনকি মসজিদেও এক কথায় বাংলাদেশের সর্বত্র শোনা যায় একটি অসম্পূর্ণ প্রশ্ন- জাতির পিতা কে? এই প্রশ্নের প্রশ্নকর্তারা প্রশ্নোত্তর হিসেবে পেতে চায়- হযরত ইব্রাহিম (আ)। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর স্থলে শেখ মুজিবুর রহমান! নাউজুবিল্লাহ্- এ সহ্য করা যায় না। ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। ঐ স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি এদেশ থেকে ইসলাম ধর্মকে চিরতরে বিদায় করে দিতে চায়। এভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়। ঐ প্রশ্নকর্তাদের দৃষ্টি আর্কষণ করছি- বঙ্গবন্ধু না হয় সে দিন ১৯৭১ খ্রি. জাতির পিতা হলেন, কিন্তু তার আগেও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান জাতির পিতা ছিলেন বা আছেন। বিভিন্ন বিধর্মী শাসক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ তাঁদের দেশ ও জাতির জন্য অসামান্য অবদান রেখে জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেমন– ইরানের জাতির জনক সাইরাস (উপাধি লাভ-৫৪৫ খ্রিষ্টপূর্ব), চীনের জাতির জনক সুন ইয়াট-সেন (১৯১২ খ্রি), ইতালির পিতৃভূমির পিতা (পাদ্রে দেল্লা পাত্রিয়া)- দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল (১৮৬১ খ্রি.), কিউবার-কারলস ম্যানুয়েল, ইন্দোনেশিয়ার রাজা সুকর্ণ, কেনিয়ার জেমো কেনিয়াট্টো, ক্রোয়েশিয়ার- আন্তে স্তারসেভিস, মেক্সিকোর নিগুয়েল কস্টিলা, নামিবিয়ার- স্যাম নুজুমো, নেদারল্যান্ডের- উইলিয়াম দ্যা সাইলেন্ট, নরওয়ের- আইনার গার হার্ডসেন, পর্তুগালের-ডম হেনরি কুইস, রাশিয়ার- প্রথম পিটার, স্কটল্যান্ডের- ডোনাল্ড ডেওয়ার, শ্রীলঙ্কার- ডন স্টেফান, ভারতের- মাহাত্মা গান্ধী, যুক্তরাষ্ট্রের-জর্জ ওয়াশিংটন এবং আরও অনেকে। আমার জানতে ইচ্ছে করছে- বিশ্বের মুসলিমগণ প্রোক্ত জাতির জনকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় তুলছিল কিনা? বোধ করি, এ প্রশ্নের জবাব ইতিহাসের পাতায় মিলবে না। তবুও ধরে নিলাম, বিধর্মীরা এটা বিরোধিতার স্বার্থেই বিরোধিতা করেছে। কিন্তু যারা মুসলিম শাসক যেমন– আফগানিস্তানের জাতির জনক- আহমদ শাহ্ দুররানি (১৭৭২ খ্রি), আফগানরা আহমদ শাহকে বাবা বলে ডাকতো। মালয়েশিয়ার জাতির জনক- টুংকু আবদুর রহমান (১৯৫৭ খ্রি.)। মালয়েশিয়ানরা তাঁকে ডাকতো বাপা কেমারডাকান (স্বাধীনতার জনক)। তুরস্কের জাতির পিতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (আতা মানে পিতা, তুর্ক মানে তুর্কি, ১৯২২ খ্রি.) সৌদি আরবের জাতির পিতা- আবদুল আজিজ বিন্ সৌদ (১৯৩২ খ্রি.)- যার নাম অনুসারে দেশের নাম সৌদি আরব। কসোভার- ইব্রাহিম রাগোভা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের- শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল্ নাহিয়ান। তাঁরা কোন সাহসে 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত হলেন? বিশ্বের মুসলিম জাতিই বা কেন তাঁদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি? আপনাদের চেয়ে তাঁদের কি ঈমানি শক্তি কম ছিল? বিশেষ করে, মওদুদীদের কী ভূমিকা ছিল- যখন কায়েদ ই- আজম পাকিস্তানের জাতির জনক হলেন? অনেক প্রশ্ন জাগে– কিন্তু জবাব মিলবে না, তাও নিশ্চিত। তা হলে বিষয়টি বিশ্বের সর্বোচ্চ মানদণ্ড কুরআন ও হাদিসের নিরীখে নিরূপণ করা যাক– প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে সব মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)-এর সন্তান। এই হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই একই বংশের, একই

মর্যাদার ও পরস্পর ভাই ভাই। মহানবী (সা) ঘোষণা করেন, 'তোমরা সকলেই এক আদম (আ) হ'তে উৎসারিত আর হযরত আদম (আ) হলেন মাটির তৈরি।' তিনি আরও বলেন, 'সকল মানুষই হযরত আদম (আ)-এর বংশধর আর আদম (আ) মাটি থেকে সৃষ্ট (তিরমিযি)।' পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি (সূরা হুজরাত: ১৩)।' এ আলোচনা থেকে যদি প্রশ্ন করা হয়, মানব জতির পিতা কে? একটি ছোট্ট শিশুও বলবে- হযরত আদম (আ)- এর বিকল্প জবাব নেই, ছিল না, থাকবে না। হযরত ইব্রাহিম (আ)- হিব্রু ভাষায় যার নাম অব্রাহাম- এর অর্থ বহু বংশের পিতা। তাঁর দুই ছেলে, হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ)। হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র হযরত ইকাকুব (আ) যার অপর নাম হযরত ইসরাঈল (আ)। হযরত ইসরাঈল (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত দু'হাজার বছরের মধ্যে চার হাজার নবী- রাসূল আগমন করেছেন। আর বণি ইসরাঈল গোত্রেই জন্ম নিয়েছে ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়। অন্যদিকে, হযরত ইব্রাহিম (আ) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উভয়কে [হযরত ইব্রাহিম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)] আপনার প্রতি আত্মসমর্পণকারী দু'জন মুসলমান বানান এবং আমাদের বংশধর হতেও আপনার অনুগত মুসলিম উম্মাত বানান।' (২ : ১২৮)'

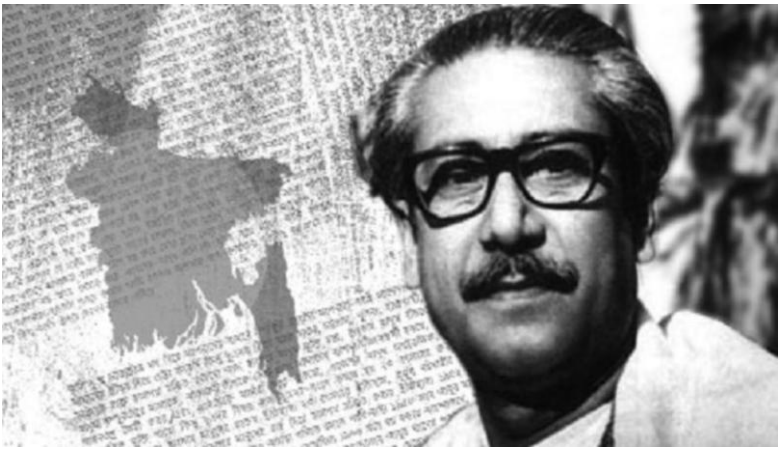

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইব্রাহিম (আ)-এর দোয়া কবুল করেন। ফলে হযরত ইসমাঈল (আ) কুরাইশ ও উত্তর আরবের 'আদনান' বংশের আদি পিতা এর ৭০ তম বংশে একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর আবেদনের ভাষানুযায়ী পবিত্র কুরআনে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' নামকরণ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আ) এই মহান ব্যক্তিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তিনটি ধর্মের লোকেরা অর্থাৎ ইহুদি খৃস্টান ও মুসলিমরা তাদের পূর্ব পুরুষ বলে দাবি করে থাকেন- যা অবধারিত সত্য। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, মুসলিম জাতির পিতা কে? একমাত্র জবাব, হযরত ইব্রাহিম (আ)। শুধু যুক্তি দিয়ে প্রমাণ নয়, পবিত্র কুরআনেও তা সুস্পষ্টভাবে

সাক্ষ্য দিচ্ছে যে- 'এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ। তিনিই পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' (সূরা হাজ্জ: ৭৮)'

আপনি যদি পাকিস্তানের নাগরিক হন তা হ'লে আপনার জাতির পিতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। আপনি যদি বাংলাদেশের নাগরিক হন অর্থাৎ বাঙ্গালি হন তা হ'লে আপনার জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'। মানে বাঙ্গালি জাতির পিতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলায় কথা বলতে আপত্তি নেই, বাংলাদেশের নাগরিক হতে আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু জাতির পিতাতেই। ঠিক আছে, তোমরা বাঙালি জাতির পিতা স্বীকার করনা বেশ, চুপ করে থাক কিন্তু অপব্যাখ্যা দিয়ে ঈমানকে নষ্ট কর কেন এবং সাধারণ মানুষকেই বা বিভ্রান্তিতে ফেল কেন? তোমাদের এ ধরনের মন্তব্যে প্রমাণ করে, তোমরা একেবারেই মূর্খ বা জ্ঞানী তবে জেনে শুনে সত্যকে গোপন করছ কিংবা অপব্যাখ্যা দিচ্ছ- যা চরম ভণ্ডামী, ইসলাম সমর্থন করে না। প্রসঙ্গত– ছোট্ট একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি। কোন এক জাতীয় দিবসের আলোচনায় ঘটনাক্রমে শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের উপর আলোচনা করলাম। আলোচনা ও অনুষ্ঠান শেষে বাড়ির পথ ধরলাম। পথিমধ্যে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন এমন দু'জন মাওলানা ও একজন সাধারণ শিক্ষক পরস্পর সালাম বিনিময়ের পর একজন মাওলানা বললেন, "স্যার, আপনার আলোচনা শুনলাম, ভালই লাগল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়- যিনি জাতির পিতা, তিনি আবার 'বন্ধু' হন কীভাবে?" পথিমধ্যে অনেক লোকজন তাই ক্রোধ দমন করে ধীরস্থিরভাবে জবাব দিলাম, 'আপনার বাবা, আপনার ভাই হয়- যদি আপনারা মুসলিম হন।' মহানবী (সা) বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই (বুখারি)।' দেশ, বর্ণ ও ঐশ্বর্য নির্বিশেষে ইসলামে সকল মুসলমান ভাই-ভাই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' (সূরা-আল্ হুজরাত ঃ ১০)।

পিতা যদি ভাই হতে পারে, তা'হলে পিতা বন্ধু হতে আপত্তি কোথায়? মাওলানা সাহেব, 'হুম'! বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পারস্পরিক সালাম বিনিময় না করেই বিদায় নিলেন। মনের মধ্যে কোন ভ্রান্ত ধারণা একবার পোষণ করলে তা দূর করা বড়ই কঠিন।

পরিশেষে আহবান, অসম্পূর্ণ প্রশ্নটির শুরুতে একটি বিশেষণ যোগ করি এবং সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করি, সত্যকে সত্য বলে প্রচার করি। আদম (আ) মাটির তৈরি'- এ হাদিসাংশের সারবস্তু হিসেবে এসেছে, 'মানুষে মানুষে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের কোন সুযোগ নেই।' প্রোক্ত কুরআন ও হাদিসের বরাতে তামাম দুনিয়ার মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই। তাই পারস্পরিক সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করি।♦

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, কলাগাছিয়া এএসএম সেকান্দার আলী চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ, গলাচিপা, পটুয়াখালী

নতুন প্রজন্মের জন্য জরুরি

বঙ্গবন্ধু চর্চা

রোকেয়া আক্তার

প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ইমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর চারিত্রিক সুদৃঢ়তার কথা। রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার কথা বলতে গিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুকে ভিন্নমাত্রায় চিত্রিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বহুমাত্রিক রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচিত্র। বলা চলে বঙ্গবন্ধু একাই তাঁর সময়ের রাজনীতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সফলভাবে। মূলত বঙ্গবন্ধুর ইস্পাত কঠিন মনোবলের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। এই উপমহাদেশে বহু রাজনৈতিক নেতা আছেন যাদের ক্যারিশমেটিক গুণাগুণ তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়– অতীতে এ রকম বহু নেতার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্য। 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বলে বিশ্ব পরিচিত এই নেতার তাঁর রাজনৈতিক গুণাবলী দিয়ে এই উপমহাদেশ তো বটেই পৃথিবীর বিভিন্ন অধিকার বঞ্চিত মানুষের পরম

নির্ভরশীল আদর্শিক নেতায় পরিণত হয়েছেন। যে কারণে মৃত্যুর পরও এত বছর পরও বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐশ্বরিক শক্তিতে আমাদের চিন্তার নানা জগতে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করে যাচ্ছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কাব্য নাটিকা, ছড়া, গবেষণা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, স্মৃতিচারণ, চিত্রকলা– সৃজনশীল মাধ্যমের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বে নেই। প্রবীণ সাংবাদিক কে.জি মোস্তফা তাঁর এক স্মৃতিকথায় বলেছেন, জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবাদপত্র, গণমাধ্যমের যতটা জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থান করার অন্যতম কারণ বঙ্গবন্ধুর আকাশ সমাজ ব্যক্তিত্ব, প্রজা, মেধা আর বিচক্ষণতা। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মনে করেন বাংলাদেশের আগামী দিনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণাকর্ম, অভিসন্দর্ভ পত্র আরও বেড়ে যাবে। নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠার জন্য বঙ্গবন্ধু-চর্চার বিকল্প নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই উপমহাদেশে এতো বেশি শিল্প-সাহিত্য-গণমাধ্যমে সম্পর্কিত অভিসর্ন্দভ, রচনাও ও গবেষণা অতীতে কখনো হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কি না তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। বাঙালিদের তুলনায় বঙ্গবন্ধু মুজিবের উচ্চতা ছিল একটু বেশিই। ৫ ফুট ১১ ইঞ্চির উচ্চতার এই মানুষ নানাভাবে অতিক্রম করে গেছেন তাঁর চারপাশকে। নিউজ উইক-এর ৫ এপ্রিল ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিবেদন লেখা হয় যার নাম দেয়া হয়েছিল 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বা 'রাজনীতির কবি'। এই লেখার এক জায়গায় প্রতিবেদক বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছেন, 'একজন কূটনীতিক বলেন, একাকী তার

সঙ্গে কথা বলার সময়ও মনে হয় তিনি যেন ৬০ হাজার লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন।' উর্দু, বাংলা, ইংরেজি– পাকিস্তানের তিনটি ভাষায় তাঁর পটুত্ব আছে। নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ বলে ভান করেন না মুজিব। তিনি রাজনীতি কবি-প্রকৌশলী নন; তবে বাঙালিরা যত না প্রায়োগিক তাঁর চেয়ে শৈল্পিক বেশি। কাজেই এই অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, তাঁর রীতিতে হয়তো ঠিক তা-ই আছে।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। তখনো স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে। বঙ্গবন্ধু তখনো পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অনবদ্য, কালোত্তীর্ণ ছড়া লিখে ফেলেছেন, 'যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী মেঘনা বহমান। ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ রহমান। দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান। তবু নাই ভয় হবে জয়, জয় মুজিবের।' বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকাকালে তাকে নিয়ে এই অসাধারণ ছড়াটি লিখে সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন।

দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু খুব বেশিদিন বেঁচেছিলেন না। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কাছে তিনি পরাজিত হয়ে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হন। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর দেশ যাত্রা শুরু করল অন্ধকারের দিকে। পাকিস্তান প্রত্যাগতদের আধিপত্যে দেশে তখন বঙ্গবন্ধুর নাম নেয়া অলিখিতভাবে বন্ধ। সে সময় অবস্থাটা ছিল এ রকম যে, দেশের সামরিক সরকাররা জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধুকে যেন বেশি ভয় পায়। বেতার, টেলিভিশন, সংবাদমাধ্যম– কোনো জায়গায়ই তারা বঙ্গবন্ধুর নামকে উচ্চারণ করতে দিতে চান না। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কতিপয় অসৎ মানুষের পাল্লায় পড়ে এক অদৃশ্য ঘেরাটোপে বন্দি থাকলেও মুজিব-ভক্ত বাংলার লাখ লাখ মানুষের নিঃসৃত কণ্ঠ থেকে সিংহপুরুষের নাম কীভাবে হারিয়ে যায়! বস্তুত বঙ্গবন্ধু সেই থেকে নানাভাবে, নানা মাত্রায় উদ্ভাসিত হতে থাকেন আমাদের সমগ্র সত্তায়, মেধায় মননে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর তাকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেন নির্মলেন্দু গুণ। তার ধারবাহিকতায় দেশের প্রবীণ লেখকও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখেছেন। নির্মলেন্দু গুণের এই কবিতার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালি জাতির যে অফুরান্ত ভালোবাসা তা-ই হয়ে উঠেছে। অসীম সাহসের সঙ্গে নির্মলেন্দু গুণ উচ্চারণ করলেন, 'সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি। রেসকোর্স পার হয়ে যেত সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ। গতকাল আমাকে বলছে,

আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তার কথা বলতে এসেছি।' শামসুর রাহমান লিখেছেন, 'গাছের ধূলিকণা চলছে অবিরাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর, অমর তোমার নাম।' কবি ত্রিদিব দস্তিদার লিখেছেন, 'বাঙালির ডাক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর। কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা লিখেছেন, 'বাংলার নামে বাগান জোড়া, হাজার বরণ ফুল, সব বরণ আজ এক বরণ, মুজিব-বরণ ফুল।' কবি সুফিয়া কামাল লিখেছেন, 'হেরিতে এখনো মানব হৃদয়ে, তোমারই আসন পাতা, এখনও মানুষ স্মরিছে তোমাকে। ভাইবোন-পিতা-মাতা।' ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন লিখেছেন, 'ফরিদপুরের অখ্যাত এক, টুঙ্গিপাড়া গ্রাম ইতিহাসে টুঙ্গিপাড়া নাম লিখে রাখলাম। বাংলাদেশের ইতিহাসে, অনন্য সেই নাম ইতিহাসে শেখ মুজিবের নাম লিখে রাখলাম।' ছড়াকার সুজন বড়ুয়া লিখেছেন, 'তাকে আড়াল করে এমন নেই হিমালয় কোনো আকাশে আর বাতাসে তার ডাক শোনো, নাম শোনো।' কবি আসলাম সানি লিখেছেন, 'একটি মুজিব ঘুমিয়ে আছে টুঙ্গিপাড়ার ঘাসে, খুঁজে দেখো, একটি মুজিব আছে তোমার পাশে।' ছড়াকার আমীরুল ইসলাম লিখেছেন, 'নীল আকাশের তারায় তারায় মুগ্ধ আমার দুচোখ হারায়, কাশের বনে ঘাসের বনে একটি ছবি থমকে দাঁড়ায়, ফুলে ফুলে হলদে ধানের, সুরে সুরে পাখির গানের, ছবিটা কার? ছবিটা কার? শেখ মুজিবুর রহমানের।' এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সৃষ্টিশীল ছড়া-কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখেছেন দেশের নামকরা সব লেখক। তাকে নিয়ে রচিত হয়েছে হাজার হাজার ছড়া-কবিতা-গান। পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন, রোকনুজ্জামান খান, দিলওয়ার, মাহমুদুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, সুকুমার বড়ুয়া, হায়াৎ মামুদ, মহাদেব সাহা, মাহবুব সাদিক, জাহিদুল হক, অসীম সাহা, হাবিবুল্লাহ সিরাজী, বিমল গুহ, রবীন্দ্র গোপ, কামাল চৌধুরী, মুহাম্মদ সামাদ, খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, নামের মাহমুদ, আহমাদ উল্লাহ, আলম তালুকদার, সারওয়ার-উল-ইসলাম, রোমেন রায়হান, রুদ্রাক্ষ রহমান, মাসুদুল হাসান রনি, ওবায়দুল গণি চন্দন, ওয়াসিফ-এ-খোদা, ফারুক নওয়াজ, শফিকুর রাহী, রাশেদ রউফ, আশরাফুল আলম পিন্টু, হাসনাত আমজাদ, সৈয়দ নাজাত হোসেন, সোহেল মল্লিক, কাজী রোজী, ধ্রুব এষ, আনজির লিটন, মিলন সব্যসাচী, নীহার মোশাররফ, রহীম শাহ।

ছড়া-কবিতার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের কথা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ জমিন জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবুল ফজল তার সাড়া জাড়ানো গল্প 'মৃতের আত্মহত্যা' লেখেন সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা সমকাল-এ। সমকালে গল্পটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে পাঠকমহলে তুমূল আলোচনার ঝড় ওঠে। গল্পটি

তৎকালীন সরকারের নেপথ্য নায়ক জেনারেল জিয়ার প্রতি একজন উপদেষ্টার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জও বটে। মূলত আবুল ফজলের 'মৃতের আত্মহত্যা' গল্পটির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের এক অনলোকিত অধ্যায়ের দরোজা খুলে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আবুল ফজলের ছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক। একে অন্যকে বুঝতেন।

কোনো আবুল ফজল লিখেছিলেন 'মৃতের আত্মহত্যা' গল্পটি? ৪ অক্টোবর ১৯৭৫ তারিখে আবুল ফজল তার ডায়রিতে লেখেন, 'শেখ সাহেবের হত্যা সম্পর্কে আমি অবনরত বিবেকের একটা দংশন অনুভব করছি। এত বড়ো একটা দ্বিতীয় কারবালা ঘটে গেল দেশে, নির্মমতায় যে ঘটনার জুড়ি নেই ইতিহাসে। সে সম্পর্কে দেশের সর্বাপেক্ষা সচেতন অংশ শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবী সমাজ কিছু মাত্র বিচলিত বোধ করছে না, এ ভাবা যায় না। আশ্চর্য, মননশীল লেখক-শিল্পীদের মধ্যে তেমন একটা সাড়া দেখা যায়নি এ নিয়ে। আগের মতো এখনো আমাদের তরুণ কবিরা একটানা অতি নিরস ও নিষ্প্রাণ প্রেমের বা আমি-তুমি' মার্ক কবিতা লিখে চলেছেন।'

আবুল ফজলের এ লেখা থেকে বোঝা যায়, পচাত্তরের আগস্টের পর থেকে তিনি এ নিয়ে কিছু লেখার তাগিদ অনুভূত করছিলেন। দুসপ্তাহের মধ্যে তিনি লিখে ফেললেন, 'বিবেকের সঙ্কট' নামের এক প্রবন্ধ। মূলত 'মৃতের আত্মহত্যা' গল্পটির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিষয়ক লেখালেখিতে প্রাণ সঞ্চার ঘটে। আবুল ফজলের হাত ধরে একটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতিবাদী অবস্থান অন্যান্য লেখকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে সহায়তা করে। লেখকরা তাদের দায়বোধ থেকে এ ব্যাপারে কলম হাতে তুলে নেন। আবুল ফজলের

ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল সব লেখক তাদের গল্পে-উপন্যাসে বঙ্গবন্ধুকে নানা মাত্রায় উদ্ভাসিত করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর একটি অংশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং তার জের ধরে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর নানা অধ্যায় উঠে এসেছে। এছাড়া প্রখ্যাত লেখক শওকত ওসমান, হুমায়ূন আহমেদ, রশীদ হায়দার, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, ইমদাদুল হক মিলন, সৈয়দ ইকবাল, সেলিনা হোসেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আখতার হুসেন, কাইজার চৌধুরী, আনিসুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, মাহবুব রেজা, শাহজাহান কিবরিয়া, মুনতাসীর মামুন, মনি হায়দার, রফিকুর রশীদ, হুমায়ূন কবীর ঢালী, সারওয়ার-উল-ইসলাম, শরীফ খান, ইমতিয়ার শামীম, শাহনেওয়াজ চৌধুরী, আমীরুল ইসলাম, শিরীন বকুল, আনিস রহমান প্রমুখ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য মৌলিক রচনা লিখেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত এসব গল্প-উপন্যাস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বঙ্গবন্ধু এখন নতুনভাবে চিত্রিত হচ্ছে। সমালোচকরা বলছেন, দিন যতই যাচ্ছে নবপ্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু নতুন মাত্রায় চিহ্নিত হচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে যত গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হয়েছে তা আর কাউকে নিয়ে রচিত হয়নি– এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, কামাল আতাতুর্ক, মাও সেতুং, লেনিন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র

বসু, নেলসন ম্যান্ডেলাসহ আরও নাম করা নেতৃবৃন্দের নামেও বিপুল গ্রন্থ রচিত হয়নি। বলা হয়ে থাকে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়েই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে বঙ্গবন্ধু চর্চা এক স্বাতন্ত্র্য পরিচয়ের দাবি রাখে। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামলী ঘোষের 'দি আওয়ামী লীগ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়ার 'ইমারজেন্স অব বাংলাদেশে অ্যান্ড রুল অব আওয়ামী লীগ' উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের 'বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব' এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মানের 'লিডারশিপ অব শেখ মুজিবুর রহমান' উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের ১৫টি বইও প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ওপর দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় ৫০০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে– তাকে ঘিরে প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার হবে।

বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে মূল্যবান ও সংগ্রহ সংরক্ষণের অভাব রয়েছে। তারপরও যারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্য এসব মূল্যবান তথ্যাদি ও উপকরণ জোগান জরুরি। বঙ্গবন্ধু চর্চা কেন্দ্র নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তথ্যের জোগান দেয়ার কাজটি আরও নিবিড়ভাবে করতে হবে বলে বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট বলছেন।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ যেন সমার্থক শব্দ। ১৯৯১ সালে 'বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা' শিরোনামে একটি বই বের করে যাতে প্রায় সাড়ে তিনশ বইয়ের একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত দুদশকে গ্রন্থপঞ্জির বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০০ ছাড়িয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু গ্রন্থপঞ্জির বইগুলোকে ১৫টি শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো– ১. ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু; ২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান; ৩. মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু; ৪. রাজনীতি, প্রশাসন ও পররাষ্ট্রনীতি; ৫. মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ; ৬. স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ; ৭. আলোকচিত্র ও দলিলপত্র; ৮. প্রবন্ধ সংকলন; ৯. গল্প-উপন্যাস; ১০. কবিতা ও ছড়া; ১১. যাত্রা, নাটক ও সঙ্গীত; ১২. জীবনীগ্রন্থ; ১৩. শিশুতোষ; ১৪. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড; ১৫. ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ।

বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু চর্চার কোনো বিকল্প নেই বলে ইতিহাসবিদরা মনে করছেন।♦

জন্ম : ১০ জুলাই ১৮৮৫, মৃত্যু : ১৩ জুলাই ১৯৬৯

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
খাঁটি বাঙালি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান

এম আবদুল আলীম

জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ১৩৬তম জন্মদিন (১০ জুলাই ২০২১)। এ দিনে তাঁকে নিয়ে লিখতে বসে মাথায় নানা প্রশ্ন ভিড় জমায়; প্রশ্ন আসে তিনি কিসে বড়? বাঙালিত্বে, মুসলমানিত্বে, না মনুষত্বে? যদিও এককথায় এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি সবকিছুতেই বড় ছিলেন। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো আমরা সাধারণ বোধ-বিবেচনা নিয়ে তাঁর জীবন, চিন্তা ও কর্মের যেদিক পর্যালোচনা করি, সেদিকই বড় বলে মনে করি। এগুলোর মধ্যে তুলনা করলে তাঁর বাঙালি সত্তাটিকে আবার বেশি বড় বলে মনে হয়। কারণ, বাঙালিত্বের পরাকাষ্ঠায় তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এর প্রমাণ আছে তাঁর কথায়, লেখায় এবং কাজে। মুসলিম লীগের দোর্দণ্ড প্রতাপের কালে, প্রবল বৈরী স্রোতে দাঁড়িয়েও তিনি দৃঢ় চিত্তে উচ্চারণ করেছিলেন : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন

আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।' কেবল কথায় বা লেখায় নয়, এ বিশ্বাস তিনি চেতনার গভীরে লালন করেছেন। ফলে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যখন বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়, তখন তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন শুরুর বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষার পক্ষে তিনি অবতীর্ণ হন ওকালতির ভূমিকায়। এ ভাষা যে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা এবং এর চর্চা এবং বিকাশের ভেতর দিয়েই যে বাঙালি মুসলমানের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হতে পারে– এ কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের আলোয় ভারতবর্ষের মুসলামানদের জাগ্রত করতে ১৯১১ সালে সমমনাদের সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'। তরুণদের চেতনা শানিত করতে বারবার বলেছেন : 'তোমরা বাঙালী, তোমরা বাঙালী মুসলমান। বাঙলার আবহাওয়ায়, বাঙলার মাটিতে, বাঙলার শস্যে, বাঙলার ফলে তোমাদের দেহ গঠিত, পুষ্ট, বর্দ্ধিত। ... জানিও দেশের সুখ-দুঃখ শুভাশুভের সহিত তোমাদের সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ এক নাড়ীতে বাঁধা। তোমাদের জন্মভূমিও তোমাদের নিকট কিছু আশা রাখে।' এভাবে বাঙালি এবং বাংলার তরুণ ও যুবসমাজকে জাগ্রত করতে তিনি একের পর এক রচনা করেছেন 'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা', 'আমাদের ভাষাসমস্যা', 'বাংলা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ', 'ভারতের সাধারণ ভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ।

তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। সেজন্যে তিনি এ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষা চাই-ই।' একইভাবে প্রশ্ন ছুড়ে দেন– 'মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে?' বাংলা-উর্দু বিতর্কে তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক সভায় ভারতের বিভিন্ন ভাষার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবির যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করে বলেন, সাহিত্যের শক্তির দিক থেকে একটি মাত্র ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় দাবি রাখে, সেটি হলো বাংলা ভাষা। দেশভাগের প্রাক্কালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দুকে ভাবী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার করার পক্ষে যে বাণীটি ছুড়ে দিয়েছিলেন, সেটি প্রতিহত করতে সবচেয়ে ধারালো যুক্তি তুলে ধরেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি লেখনীকে যেমন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অস্ত্র বানিয়েছিলেন, তেমনি বজ্রমুষ্ঠি তুলে

রাজপথে নেমে স্লোগান দিয়েছেন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। 'দৈনিক আজাদ' সাক্ষ্য দিচ্ছে, ১৯৪৮ সালে ৪ মার্চ বগুড়ার আলতাফুন্নেসা মাঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে হাজার হাজার লোকের যে সমাবেশ হয়েছিলো, তাতে সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তখন তিনি আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। রোমান এবং উর্দু হরফে বাংলা প্রচলনে পাকিস্তান সরকার যে অপতৎপরতা চালায় তিনি তার ঘোর বিরোধিতা করেন। ১৯৫১ সালের ১৫ মার্চ কুমিল্লা শিক্ষা-সম্মেলনে গিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এক অভিভাষণে বাংলা ভাষা অবহেলিত হলে বিদ্রোহ করবেন বলে ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এও বলেন, পূর্ববঙ্গে নতুন ভাষা জোর করে চাপালে সেটা হবে গণহত্যার শামিল। কী তার দূরদৃষ্টি! এর মাধ্য ২০ বছর পরে পূর্ববঙ্গের মানুষ পাকিস্তানি হায়না ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে ভয়ংকর গণহত্যার শিকার হন। ঐ সময় সিলেটের 'নও-বেলাল' এবং কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকায় তাঁর এ বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়; আগ্রহীরা দেখতে পারেন ২৩ মার্চ ১৯৫১-এর 'নও-বেলাল' এবং ৩০ মার্চ ১৯৫১-এর 'যুগান্তর'। বায়ান্নতে এসেও তাঁর প্রতিবাদী চেতনায় পরিবর্তন আসেনি; বরং তাতে প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর হতাহতদের দেখতে তিনি হাসপাতালে ছুটে যান। শুধু কী তাই, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে তিনি নিজের কালো আচকান কেটে হাতে বেঁধে শোকজ্ঞাপন ও প্রতিবাদ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের হামলায় আহত ছাত্রদের শুশ্রুষায়ও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেই ভয়াল দিনের স্মৃতিচারণ করে আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছেন : 'আমরা যখন কার্জন হলের সামনে তখন মিছিলের ওপর গুলি, লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস ছোড়া আরম্ভ হয় এলোপাতাড়িভাবে। ... তখন প্রাণভয়ে আমরা কার্জন হলে ঢোকার চেষ্টা করি। ... আমি লাফ দেবার আগেই পুলিশ এসে-গিয়েছিল। তারা আমার পায়ে লাঠিচার্জ করে। ডান পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ... আমাকে ওরা (পুলিশ) টেনে কার্জন হলের ভেতরে নিয়ে যায়। আমি ফিট হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম ডক্টর শহীদুল্লাহ্ আমার পায়ের কাছে বসে আছেন। তিনি নিজ হাতে আমার পায়ে বরফ ঘঁষে দিচ্ছেন। আমি খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম।' বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করায় মুসলিম লীগ সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ড. শহীদুল্লাহকে 'ট্রেইরর পণ্ডিত' বলতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু সেসব তিনি তোয়াক্কা করেননি। কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান কিংবা রাজপথের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেই নয়, বাংলা ভাষার সুলুক-সন্ধান, 'চর্যাপদে'র কালনির্ণয় ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র দিকের গভীর

অধ্যয়ন-অন্বেষণ এবং বাংলা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নসহ বিভিন্ন দুরূহ কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন, যার অনেকগুলোই এখন বাঙালির চিরায়ত সম্পদ হয়ে উঠেছে। তাঁর সেসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– 'সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা', 'ভাষা ও সাহিত্য', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'আমাদের সমস্যা', 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'বিদ্যাপতি শতক', 'বাংলা আদব কী তারিখ', 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বৌদ্ধ মরমীয় গান' প্রভৃতি। তাঁর সম্পাদিত 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ধ্রুপদী গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছেলে মূর্তজা বশীর-এর সাথে

বহু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন এবং বাঙালিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধর্মবিমুখ ছিলেন না। বংশ-পরম্পরাগতভাবে তাঁরা ছিলেন পীর গোরাচাঁদের খাদেম। এই সূত্রে শহীদুল্লাহ্ আজন্ম আধ্যাত্মিক পরিবেশে লালিত হয়েছেন এবং আমৃত্যু নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মপালন করেছেন। তবে তিনি কূপমণ্ডুক বা বকধার্মিক ছিলেন না। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদ ছিলো, এখনো আছে। ভক্তদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ধর্মসভা করেছেন জেলায় জেলায়। তাঁকে ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠান যেন পূর্ণতা পেত না। তাঁর লেখনীতেও স্থান পেয়েছে ধর্মের নানাদিক। আল্লাহ, কুরআন, নবী-রাসূল ও আউলিয়াদের নিয়ে তিনি রচনা করেছেন– মহানবী, বাইঅতনামা, কুরআন প্রসঙ্গ, মহররম শরীফ, ইসলাম প্রসঙ্গ, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী প্রভৃতি গ্রন্থ। গ্রন্থগুলো তাঁর ধর্মনিষ্ঠার গভীরতায় প্রোজ্জ্বল। কর্মজীবনে তিনি সফল ছিলেন; শুরু করেছিলেন যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে, এরপর কিছুদিন

বসীরহাটে ওকালতি করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ চৌধুরী তাঁকে নিযুক্ত করেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা-সহকারী পদে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। বগুড়া আজিজুল হক কলেজের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, –ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। কর্মে যেমন নিপুণ, তেমনি সংসারধর্মের ছিলেন দায়িত্বশীল। গবেষণা ও সাধনার স্বীকৃতি-স্বরূপ জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর লাভ করেছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনের নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' ও 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' (মরণোত্তর) খেতাবে ভূষিত করে, বাংলাদেশ সরকার দেয় একুশে পদক (মরণোত্তর)। ফরাসি সরকারও তাঁকে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে ডি-লিট উপাধি। তাঁর মতো গভীর অনুধ্যানী-অনুসন্ধানী এবং মননশীল পণ্ডিত কোনো জাতির মাঝে শতাব্দীতেও একজন জন্মায় না। সেদিক থেকে বাঙালি সৌভাগ্যের অধিকারী।

জ্ঞান-সাধনায় এবং আচরিত জীবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের আইকন। জীবনাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই জ্ঞানতাপস মনীষীর মনুষ্যত্বও জাতিকে পথ দেখিয়েছে। তাঁকে বলা হয় 'পূর্ণ মানব'। নিজধর্মে নিষ্ঠাবান থেকেও বৃহত্তর মানবধর্ম এবং মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখায় সদা তৎপর ছিলেন। দীর্ঘজীবনের অধিকারী এই সাধক-পুরুষ কখনও সুবিধাবাদের কাছে নিজের বিবেককে বিকিয়ে দেননি। ছিলেন সত্যভাষী, প্রিয়ংবদ, কর্তব্যে অবিচল এবং কঠোর পরিশ্রমী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ছিলেন সৎ ও নিষ্কলঙ্ক। বিবেকবান এবং সত্যবাদী এমন মানুষ সকল কালের সকল সমাজে অনুসরণযোগ্য। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের বাঙালি বুদ্ধিজীবীকূলের শিরোমণি।

পাকিস্তানবাদী ভাবধারার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঝান্ডা হাতে সব সময় পথ চলেছেন। বাঙালিদের এই চেতনার ভিত মজবুত করা এবং স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অগ্রপথিকের। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেছেন, 'আমাদের আত্মপরিচিতি আবিষ্কারে এবং স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।' বাস্তবেই বাঙালির আত্মপরিচয় আবিষ্কারে তাঁর অবদান অপরিসীম। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনায়, বাঙালির মনন-নির্মাণে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্তকরণে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা কোনোদিনই মোছার নয় চির-স্মরণীয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁর অবদানকে এ কালের মানুষ যতটা স্মরণ করার কথা ততটা করে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর জীবন ও কীর্তিগাথা তুলে ধরার কোনো প্রয়াস নেই বললেই চলে। তাঁর সমাধিস্থলটি পর্যন্ত রয়েছে সীমাহীন অযত্ন-অবহেলায়। হতভাগা এই দেশে গুণীর কদর নেই সেটা তিনি জীবদ্দশাতেই উপলব্ধি করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে সে-মর্যাদা দেয়নি, যেটা তাঁর প্রাপ্য ছিলো। মৃত্যুর পূর্বে এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, আমার কথা লিখতে চাইলে লিখে দিয়ো, তিনি দ্রুতই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন! না, তাঁর এই অভিমানভরা উক্তি বাঙালি গ্রহণ করেনি। তিনি বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাননি, যাবেন না কখনও। এখনও তিনি কিংবদন্তি বাঙালি বুদ্ধিজীবী। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পঠন-পাঠন করা হয়; তাঁর জীবন, কর্ম ও সাধনা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা হচ্ছে; এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আজও তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। তাঁর মতো 'পূর্ণ মানব' বা 'ইনসান্-আল্-কামিল'কে বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না। তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষী হিসেবে তো বটেই; এ কালের বাঙালিরাও তাঁকে প্রজ্ঞাদীপ্ত মনীষী হিসেবে শ্রদ্ধা করে। করবেই তো, কারণ– শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেছেন আপন গুণ ও কর্মের দ্বারা। কেবল এক কালে নয়, শিষ্য-পরম্পরা তিনি বেঁচে থাকবেন যুগ-যুগান্তর ধরে। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আনিসুজ্জামান বলেছেন, শহীদুল্লাহ 'গজদন্তমিরারবাসী পণ্ডিত' ছিলেন না', ছিলেন সমাজ ও মানুষ-সংলগ্ন এক দরদি পণ্ডিত। নতুন প্রজন্ম এই পণ্ডিতের জীবনদর্শন, পাণ্ডিত্য ও চিন্তার আলোয় আলোকিত হোক; নানাবিধ অবক্ষয়ের অতলে ডুবে থাকা সমাজ তাঁকে গ্রহণ করুক আইকন হিসেবে। এই খাঁটি বাঙালি, নিষ্ঠাবান ধার্মিক এবং উদার মানবতাবাদী চিন্তকের দেখানো পথই হোক তাদের চলার পথের দিশা; তাদের চিত্তদুয়ারে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শ প্রজ্বলিত থাকুক অনির্বাণ শিখা হয়ে।♦

আঁধারের সিঁড়ি ভেঙ্গে

খালেক বিন জয়েনউদদীন

তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে অসীম আকাশে নিতে পারো
দিতে পারো সুফলা জমি, পাল তোলা নৌকা ও জোছনা।

তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারো
দেবদারুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে সৃষ্টির গান শোনাতে পারো
তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বিস্মৃতির স্মৃতি জাগাতে পারো
ঝড়ের রাতে ডানা ভাঙা হরিয়ালের ছায়া দেখাতে পারো।

আমি শেষ বিকেলের যাত্রী, প্রচ্ছন্ন অভিমানে দাঁড়িয়ে
তোমার ইচ্ছের কথা ভাবছি, আর সমুদ্রের ঢেউ গুনছি
কখন উঠবে শিরীষের মাথায় চাঁদ, আকাশভরা নক্ষত্র
দুগ্ধবর্ণ বাতাসে চড়াবে সবুজ শষ্যের সুঘ্রাণ।

আপেক্ষায় আছি, পয়ষট্টি বছর আঁধারের সিঁড়ি ভেঙে।

জন্মের ভিতর শব্দ

হাসান হাফিজ

জেগে থাকলে সাড়া দাও
গোঙানি হলেও আলতো শব্দ করো,
শব্দই জীবন জানি, শব্দওমে ফুল ফোটে
প্রবাহিত হয় নদী, হাওয়া বয়
চাঁদের চঞ্চল জোছনা ঠিকরে পড়ে
সমুদ্র ফেনায়, আর্ত চরাচরে
মাটির ভিতরে বীজ
বীজের ভিতরে ভ্রূণ
ভ্রূণের ভিতরে জন্ম
জন্মের ভিতরে শব্দ
সুপ্তি হয়ে অধিষ্ঠান করে, থাকে অপেক্ষায়
সময় সুযোগ মত ডানা মেলবে আপন আকাশে
সেই হেতু আকাশও অপেক্ষমাণ, অস্থিরতা বাড়ে ধীরে ধীরে
শব্দই স্বয়ম্ভু, শক্তি, উত্থানের সৃজনগরিমা
কবিতার কণ্ঠহার লাবণ্যশর্করা স্নেহ
সবকিছু– আশ্রয় প্রশ্রয়, মিহি
অভিমান ক্রোধ কাম বিবমিষা
অতীন্দ্রিয় নৃত্যমুদ্রা রিনিঝিনি,আধো তারে চিনি,
শব্দই জীবন জানি, শব্দেই জাগ্রত হয় বসন্ত মদিরা।

পানি প্রবাহের মেকানিক্স

সেলিম মাহমুদ

কথা ফুরিয়ে সেচযন্ত্র বসায় নালা দিয়ে
পানি প্রবাহের মেকানিক্স।
গুঁটি সার, মাটি সার, টি এস পি, ফসফেট
এবং কলমির ঝাড়ে ফুটেছে গগন ছেয়ে ফুল
নালার ভেতরে নড়েচড়ে ঢোঁড়া সাপ।
মাপি আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত;
স্যুয়েজ ক্যানেলের আকারে চাই
ফসলের আশির্বাদ;
যেন সে জাহাজ চলাচলও ধরে রাখে।

বিজয়

তাহমিনা কোরাইশী

সব ব্যারিকেড আজ ধূলিতে মিলায়
রয়ে যায় একটি ধ্বনি অনুরণন
বিস্তৃত-চৌহদ্দি জুড়ে... বিজয় বিজয়
মহাকালের উঠোন জুড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে
নয়টি মাসের উত্থান পতনের এক ইতিহাস
পাক হায়েনাদের অস্তিত্বের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার ইতিহাস
বাঙালী ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের এই সম্মান
আমাদের স্বাধীনতা
প্রতিক্ষার প্রহর পেরিয়ে সবুজ চত্বরে লাল সূর্য আঁকা
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত ধুয়ে দেয় ৫৪ হাজার বর্গমাইলের বেশি পথ
মৃত্যুপুরীতে প্রাণের স্পন্দন
মরা ডালে নতুন কিশোলয়
মুক্তির বিহঙ্গেরা সবুজ নীড়ের সন্ধানে ফিরে ফিরে আসে
এই সে আলয়
দুইলক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা
জীবনের চেয়ে দামি আমাদের এই সম্পদ
ডেকে ছিল সেই বাঁশিওয়ালা একদিন
তারই পিছু পিছু অতি সন্তর্পণে
আমরা যুদ্ধে
রক্তনদী ডুব সাঁতারের পারাপারে পথ বেছে নিই
হারানোর বেদনা ম্লান হয়ে আসে আজকের প্রাপ্তির কাছে
পেয়েছি মা ও মাটি
একটি আশ্রয়
যা শুধুই নিজের
অহংকারে আমাদের দৃঢ় অবস্থান।

জন্ম পুর্নজন্মের মধ্যে বয়ে চলা

আনোয়ার কবির

জন্ম পুর্নজন্মের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা জীবন
সাপের খোলসের মতো বদলায় রং
শৈশব কৈশর তরুণ যুবা পৌঢ়ত্বের অকালবোধনে
প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল মন মানস

শৈশবের বেড়ে ওঠা সময়
ভোরের নরম আলোর সূর্যোদয়
জীবনের ক্যানভাসে থেকে যায় অমলিন
যুবা পৌঢ়ত্বের সীমানায়
ঘুমের ঘোরে হাতড়িয়ে খোঁজে সোনালী শৈশব

কৈশর তরুণের অবিমিশ্র অবিমূষ্যিকতা
চঞ্চল চপলা কেটে যাওয়া সময়
জীবনের রঙিন নাগরদোলায়
আকাশছোঁয়া স্বপ্নের হাতছানি
কেটে যায় সময় বয়ে যায় বেলা

যুবকত্বের রুক্ষ কঠিন সময়
খরখরে রৌদ্রের তেজোদীপ্তময়তা
ভুলে যাওয়া সময়ের গর্ভে অমাবস্যাময়

নিবিড় নিপাট নিখাঁদ সময়ের কালপঞ্জি
পৌঢ়ত্বে ধূসর থেকে ধূসরময় অতীত
পেছন ফেরে সময়ের খেরোখাতায় আক্ষেপ
জন্ম পুর্নজন্মের মধ্যেই বয়ে চলে অন্তঃহীন জীবন!

লেজ যতই মোটার দিকে

তোফায়েল তফাজ্জল

লেজ যতই মোটার দিকে,
পতনের দূরত্ব ততই খাটো হয়ে–

ক্ষমতা ও নাক এতটাই উঁচু ছিলো একদিন
যার দরাজ গলার নির্দেশিকা শুনে
নীলের যৌবন হতো হাতের পুতুল,
তুড়িতে দেখাতো নাচ–
সারি বাঁধা ঢেউ সামনে যেতো
হাজারো ঘোড়াকে বানিয়ে সফর সঙ্গী,
ভাটিমুখী হতো শতো কোটি ব্যাঙ লাফকে নকলে।
সেই ফেঁপেফুলে থাকা শক্তি চুপসে গিয়ে
জ্যান্ত নিদর্শন রূপে মমি
নয়নে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে মর্ত্যকে।

এরূপ হামান, নমরুদ বা সাদ্দাদের শিষ্টাচার বহির্ভূত পাল্লা
বা গগন ছোঁয়া দাপুটে কাহিনী প্লীহাকে কাঁপিয়ে–
রোম, পারস্যের দেয়া ডাক বা গর্জন
কানের বারোটা বাজেয়নি
এমন কি কেউ ?
এভাবে শার্টের কলার নেড়ে বা লেজে খেলিয়ে কি এরা
থামাতে পেরেছে মৃত্যু-ঘণ্টা?

বরং এসব চোখের কাঁটা বা জং-ধরা রূপে
কুঁচকানো নাকের পাত্র হয়ে আছে– থাকবে আজীবন।

মুখ খুঁজি

সমীর আহমেদ

শুয়ে আছি গোধূলি সন্ধ্যায় মর্গের টেবিলে। নিয়ন বাতির
দাপটে অন্ধকার আরও ঘন ও নিবিড় হয়ে দাঁড়াতে পারছে
না আমার চারপাশে। সস্তা সিগারেটে আগুন দিয়ে নির্বিকার
ফুঁকছে ডোম। একবার আমার নগ্ন দেহের দিকে, আরেক বার
ছুরি ও কাঁচির দিকে তাকিয়ে ডুবে গেছে সে মগ্নতার সিঁড়ি বেয়ে
নিচে। একটা সিগারেটের পুড়ে যাওয়া দৃশ্যের ভেতর গেঁথে আছি
আমি ও ছুরি। এখনো জীবনকে নিংড়ে পাবার সাধ জমে আছে ঘন
হয়ে মৌচাকে মধুর মতো, জমাট রক্তের ভেতরে। ইচ্ছেরা উড়ন্ত
পাখির ছায়ার মতো অস্থির। আরও কিছুটা সময় যদি থাকা যায়
মস্তিষ্কের ঝিল্লির ভেতর! হৃদয়ে জমে আছে অনন্ত হাহাকার :
কাটাছেঁড়া হওয়ার আগে আরও কিছু প্রেম সে দিয়ে যেতে চায়।
পেতে চায় দেহের আরও মধুর কিছু উষ্ণতা। পাতার আড়াল থেকে
আরেকটি বার ডেকে উঠবে কি কোকিল কিংবা শিস দিয়ে যে দোয়েল
ভেঙেছিল নিঝুম দুপুর! আকাশে জমেছে খুব মেঘ।
তুমূল বৃষ্টিতে তাকে নিয়ে রিকশায় ঘুরে আসতে চাই
এই বিষাদগ্রস্ত শহরের সব অলিগলি। অন্ধকার আত্মার
হাহাকার নিয়ে ক্লান্ত হাওয়ারা ছুটে যাচ্ছে কোথায়?
ডোম হাতে তুলে নিয়েছে ছুরি। ধারালো ফলা এই দেহে
ঢুকে যাওয়ার আগে, আমি শুধু তাহারই মুখ খুঁজি।

শেষ কথা

মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর

খাঁচার ভেতরে আমি কিংবা
আমার ভেতরে খাঁচা ...
দ্বান্দ্বিক ভাবনায় খাবি খেতে খেতে অন্তরে চোখ পড়ে–
চেয়ে দেখি আমার ভেতরে ঘুরপাক খায় অযুত পৃথিবী
আমাকে ঘিরেও ঘুরপাক খায় নিযুত পৃথিবী

আমি-র যবনিকায় একদিন তলিয়ে যাবে তাবদ।

একজন শেখ মুজিবুর

আখতারুল ইসলাম

শেখ মুজিবুর স্বপ্ন সাহস প্রাণ ভরা এক সুর
রক্ত শিরায় বয়ে চলা নদ স্রোতের সমুদ্দুর।
শেখ মুজিবুর বন্ধু সবার ভালোবাসাময় ঘর
সবাই পেয়েছে স্নেহের ছোঁয়া কেউ ছিল না পর।

শেখ মুজিবুর অমর কবিতা গল্প উপন্যাস
শত বছরের বুক ছিড়ে ওঠা বাংলার ইতিহাস।
শেখ মুজিবুর স্বাধীনতার সে মহাকাব্যের কবি
মানচিত্রের মাঝে হেসে ওঠে লাল সবুজের ছবি।

শেখ মুজিবুর বাতাসের মতো ফুসফুসে সেই থাকে
বুকের মধ্যে যতন করেই বাংলার ছবি রাখে।
শেখ মুজিবুর পৃথিবীতে শুধু জন্মেছে একজন
তাঁর শোকে ভাই কাঁদছে সবাই কাঁদছেরে এই মন।

যার হুকুমে সব কিছু হয়

মুহা. আরফান আলী ফুলপুরী

বলতে পার কে দিয়েছেন হরেক মিষ্টি আম;
কে দিয়েছেন জাম-জামরুল এবং গোলাপ জাম;
বলতে পার কে দিয়েছেন মিষ্টি ঘ্রাণের তাল;
কে দিয়েছেন আতা পেঁপে সুমিষ্ট কাঁঠাল;

বলতে পার কে দিয়েছেন আঙ্গুর কদবেল;
কে দিয়েছেন তরমুজ পেয়ারা সুস্বাদু নারকেল;
বলতে পার কে দিয়েছেন নানান রকম কলা;
কে দিয়েছেন খেঁজুর বড়ই মিষ্টি কমলা;

বলতে পার কে দিয়েছেন ডালিম আনারস;
কে দিয়েছেন আমড়া সফেদা মিষ্টি খেজুর রস;
বলতে পার কে দিয়েছেন মজার মজার লিচু;
কে দিয়েছেন তেঁতুল জলপাই আরো কত কিছু;

বলতে পার কে দিয়েছেন মরিচে এত ঝাল;
কে দিয়েছেন নিম গাছেতে তিক্ত পাতা-ডাল;
মাটিতে জন্মে আরো কত ফলের সমাহার;
যিনি দিলেন এত কিছু কি পরিচয় তার?

তিনিই সবার প্রতিপালক তিনিই সবার রব;
যাঁর হুকুমে সব কিছু হয়, তাঁরই সৃষ্টি সব।

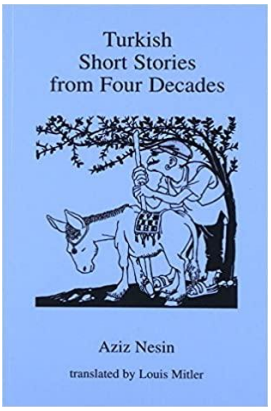

আপনাদের দেশে কি কোন গাধা নেই?

মেহমেদ নুসরাত নেসিন (আজিজ নেসিন)

অনুবাদ : কাজী আখতারউদ্দিন

আজিজ নেসিন (১৯১৫-১৯৯৫) আধুনিক তুরস্কের একজন জনপ্রিয় লেখক। তাঁর পুরো নাম মেহমেদ নুসরাত নেসিন। ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের আমলে ইস্তানবুলের কাছে প্রিন্সেস আইল্যান্ডে ২০ ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে তাঁর জন্ম। কয়েকবছর সরকারি চাকরি করার পর তিনি একের পর এক কয়েকটি ব্যাঙ্গরসাত্মক সাময়িকির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের কারণে তিনি বেশ কয়েকবছর কারাগারে বন্দি ছিলেন। সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা এবং বঞ্চনার প্রতি তার সমবেদনা ছিল এবং সেসব বিষয় নিয়ে তিনি প্রতিবাদমূলক রচনা প্রকাশ করতেন।

তিনি একশোরও বেশি বই রচনা করেছেন। আমলাতন্ত্র নিঁচু শ্রেণীর লোকদেরকে যেভাবে শোষণ করে, তিনি তা নকল করে বিকৃত লোককাহিনী

রচনা করে লেখক হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখা সেন্সার হয়েছে, এমনকি লেখার জন্য তিনি জেলও খেটেছেন। চারদিকে যে বৈষম্য আর অবিচার তার চোখে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনার মাধ্যমে লিখেছেন। তাঁর রচনার জন্য তিনি তুরস্ক, ইতালি, বুলগেরিয়া এবং তদানিন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর বই ত্রিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তৎকালীন তুরস্কে তিনিই ছিলেন একমাত্র লেখক যিনি বই রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

১৯৭২ সালে তিনি কাটালকা শহরে দা নেসিন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর চারটি গরীব এবং দুঃস্থ শিশুকে ফাউন্ডেশনের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থাসহ শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে, মাধ্যমিক স্কুল এবং কোন একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা দান, যাতে ওরা কিছু একটা পেশাগত কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে। তাঁর সকল রচনা, রেডিও-টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের কপিরাইটসহ আর যা কিছু ছিল, সব কিছু তিনি এই ফাউন্ডেশনে দান করেন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ এবং এরপর ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ এই দুইবার তিনি তুরস্কের লেখক ইউনিয়ন– তুর্কি ইয়াজারলার সেন্দিকাসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

৬ জুলাই ১৯৯৫ সালে ইজমিরের সেসমে শহরে হৃদরোগে তিনি মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মরদেহ একটি অজানা স্থানে সমাহিত করা হয়। বর্তমান গল্পটি তুর্কি ভাষা থেকে লুইস মিটলার কৃত ইংরেজির বঙ্গানুবাদ।

দুই হাতে দুই গাল চেপে ধরে দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি আসছিলেন, যেন তার দাঁতে ব্যাথা হয়েছে। আর একটু পর পর ডান হাত আর বামহাত দিয়ে গালে চড় মারতে মারতে বলছিলেন, 'ছি! ছি! কি লজ্জার কথা। কি অপমানজনক ব্যাপার!'

আমি জানতাম তিনি একটি বনেদি পরিবারের সন্তান। তবে দরজায় পা দিয়েই, কোন সালাম-আদাব দেওয়ার আগেই, 'ছি! ছি! কি লজ্জার কথা, লজ্জার কথা' বলতে বলতে, নিজেই নিজের গালে চড় মারছেন দেখে বেশ অবাক হলাম।

আমি বললাম, 'আসুন, আসুন। ভেতরে এসে আরাম করে বসুন। বলুন কেমন আছেন?'

'কিরকম আর থাকতে পারি বলুন? কিছু হওয়ার কি আর বাকি আছে? শুধু এতটুকুই বলতে পারি, চরম বেইজ্জত হয়েছি। ছি ছি! কি লজ্জার কথা।'

আমার মনে হল তার কোন বিপর্যয় হয়েছে, সম্ভবত পরিবারে দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটেছে।

'মনে হচ্ছে যেন হামাগুড়ি দিয়ে একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। আমার এখন দুই পয়সারও দাম নেই বুঝলেন, দুই পয়সার।'

'কেন? কি হয়েছে?'

'জানি না এর বেশি আর কি হতে পারে? সারা গায়ে চর্মরোগ, দুর্বল, হাড়জিরজিরে একটা গাধা ওরা একজন লোকের কাছে আড়াই হাজার লিরায় বিক্রি করেছে।'

এবার আমি একটু পিছিয়ে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। ভদ্রলোক পাগল হননি তো?

সত্যি বলতে কি একটু ভয়ই পেলাম। আমার স্ত্রীকে ডাকার অজুহাতে বললাম, 'একটু কফি খাবেন?'

তিনি বললেন, 'না কফি বাদ দিন। আচ্ছা আপনিই বলুন, দুর্বল, পায়ে নালা নেই এমন একটা গাধার দাম কি আড়াই হাজার লিরা হতে পারে?'

'কোনদিন কোন গাধা নিয়ে কোন কাজকারবার করিনি, কাজেই বলতে পারব না।'

'দেখুন, আমি নিজেও গাধার ব্যবসায়ী নই, তবে এটুকু জানি একটা গাধার দাম আড়াই হাজার লিরা হতে পারে না।'

'আপনি কি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন?'

'অবশ্যই হয়েছি। আর এতে আমার মেজাজ খারাপ না হলে, কার হবে বলুন শুনি? আপনি কি কখনও আড়াই হাজার লিরা দামের কোন গাধা দেখেছেন?'

'বিশ বছরের উপর হল আমি কোন গাধা দেখিনি।'

'আচ্ছা যাক, যে কথাটা বলছিলাম, একটা গাধার দাম কি আড়াই হাজার লিরা হতে পারে?'

'কি বলবো বুঝতে পারছি না। হয়তো এই গাধাটা এমন কিছু ভেল্কিবাজি জানে, যে জন্য এটার এত দাম হয়েছে।'

'কিসের ভেল্কিবাজি? কিচ্ছু না, সাধারণ একটা গাধা। দেখুন, এটা দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোন বক্তৃতা দিতে পারে না; সাধারণ একটা বুড়ো গাধা। সারা গায়ে খোসপাঁচড়া। আর এই গাধাটাই ওরা ঐ লোকটার কাছে আড়াই হাজার লিরায় বিক্রি করেছে আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল আমিই এটা তাকে কিনিয়েছি।'

'বলেন কি! এটা কেমন করে হল?'

'সেকথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি। ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি আমাকে স্ত্রীসহ আমেরিকায় পাঠিয়েছিল। আপনি তো জানেন আমি একবছর আমেরিকায় ছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'আমেরিকায় একজন প্রফেসারের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেখানে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তুরস্কে ফিরে আসার পরও তাঁর সাথে চিঠিপত্র আদানপ্রদান চলছিল। তিনি তুর্কিদের খুব পছন্দ করেন। একবার চিঠি লিখে জানালেন, তাঁর একজন বন্ধু তুরস্কে আসছেন। বন্ধুটি প্রাচীন আমলের গালিচার একজন বিশেষজ্ঞ আর এবার তিনি গালিচা নিয়ে একটি বই লিখছেন আর সেই বইয়ের গবেষণার কাজে তুরস্কে আসছেন। তারপর জানতে চেয়েছেন আমি তাঁর বন্ধুকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবো কি না।'

'আমি তাঁকে লিখে জানালাম তাঁর সেই গালিচা বিশেষজ্ঞ বন্ধুটি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময় আসেন, তখন আমি তাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে পারলে খুবই আনন্দিত হব। যেহেতু ঐ বিশেষজ্ঞ গবেষণাকর্মের জন্য

প্রথমে ভারত আর ইরান যাচ্ছেন, তারপর তুরস্কে আসছেন, কাজেই সে সময়টাই আমার জন্য বেশ সুবিধাজনক হবে।'

'গালিচা বিশেষজ্ঞ জুলাই মাসে এলেন। প্রফেসর বন্ধুর কাছ থেকে তিনি আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর নিয়েছিলেন। একদিন আমাকে ফোন করলেন, তারপর আমি তার সাথে দেখা করার জন্য হোটেলে গেলাম। ভদ্রলোককে বেশ সেয়ানা মনে হল।'

'চারটি বড় বড় ট্রাংকে আনা পুরোনো গালিচার সংগ্রহটা তিনি আমাকে দেখালেন। এর মধ্যে ছিল আড়াআড়ি করে সুতোয় বোনা পুরোনো কয়েকটা গালিচা আর ঘোড়া বা গাধার পিঠের দুই দিকে যে ধরনের থলি ঝোলানো হয় সেরকম কিছু থলি। বেশ তৃপ্তির সাথে তিনি জানালেন, এগুলো বিশাল সম্পদ। এর মধ্যে তিন ইঞ্চি চওড়া এবং পাঁচ-দশ ইঞ্চি লম্বা পুরোনো একটা গালিচা ছিল, যার দাম তার মতে কমপক্ষে তিরিশ হাজার ডলার হবে। তারপর বেশ গর্ব করে বললেন, এটা তিনি একজন ইরানি কৃষকের কাছ থেকে মাত্র এক ডলারে কিনেছেন। তারপর ঐ গরীব ইরানি কৃষকটা যখন এক ডলারের সমপরিমাণ দিনার হাতে নিল, তখন তার মুখে কোন কথা জোগালো না, অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সে আমাকে দোয়া করলো।'

ঐ পুরোনো গালিচাটার এত দাম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'কারণ এই গালিচাটির প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে আশিটা করে গিঁট

রয়েছে। এটা একটা মাস্টারপিস।' তারপর অত্যন্ত আবেগের সাথে গালিচা সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করলেন। প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে একশোটা গিঁটসহ মাত্র একটা দেয়ালে ঝুলানো গালিচার কথা এযাবত শোনা গেছে আর এটা কোন্ যাদুঘরে আছে তা তিনি জানেন না।'

তারপর আরেকটা গালিচা দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমি মাত্র পঞ্চাশ সেন্টে কিনেছি। অথচ এই পশমি গালিচাটার দাম কমপক্ষে পাঁচ হাজার ডলার।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব দামী জিনিস আপনি এত সস্তায় কীভাবে কেনেন?'

তিনি বললেন, 'চল্লিশ বছর ধরে আমি এই ব্যবসায় আছি। আমার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে।'

গালিচার উপর তিনি তিনটি বই প্রকাশ করেছেন, এছাড়া তার কাছে পৃথিবীর অত্যন্ত চমৎকার কিছু গালিচার সংগ্রহ রয়েছে।

আমরা আনাতোলিয়ায় ঘুরতে বের হলাম। এক জেলা থেকে আরেক জেলায় ঘুরতে লাগলাম। তিনি একের পর রঙিন ফটো তুলতে লাগলেন আর বিভিন্ন মসজিদের গালিচাগুলো দেখে অনবরত এগুলোর বিবরণ তার খাতায় টুকে রাখতে লাগলেন। তারপর কিছু লোকের কাছ থেকে ঘোড়া-গাধার পিঠে ঝোলানোর পুরোনো কয়েকটা থলি আর পশমি ছোট গালিচা কিনলেন। আমাকে জানালেন, ভারত, আফগানিস্তান আর চীনা তুর্কিস্তান থেকে যা কিনেছেন তার তুলনায় এগুলো কিছুই না। অবশ্য 'অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তুর্কি গালিচাও আছে, তবে সেগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

এবার এমন একটা জায়গায় এলাম, যেখানে তখন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চলছিল। একটি আমেরিকান এবং একটি জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক দল আলাদা আলাদা ক্যাম্প করে খনন কাজ চালাচ্ছিল।

খনন এলাকাটা একটা ছোটখাট শহরের সমান। এখানে সেই খ্রিষ্টপূর্ব ৫ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সভ্যতা মাটির নিচে রয়েছে। বেশ কয়েকটি নগর, রাজপ্রাসাদ, সমাধি ইত্যাদি মাটির নিচ থেকে বের হয়ে এসেছে।

খনন এলাকার আকর্ষণে একের পর এক গাড়িভর্তি পর্যটক, অবিরাম আসছে আর যাচ্ছে। কয়েক কিলোমিটার পরপরই পাঁচ কিংবা দশজন পর্যটকের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল।

খনন এলাকার চারপাশে কৃষকরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল আর মাটি খুঁড়ে যেসব ঐতিহাসিক আর প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহের মূল্যবান মৃৎপাত্র ওরা পেয়েছিল সেগুলো পর্যটকদের কাছে বিক্রি করছিল। আর পর্যটকরাও সেগুলো কেনার জন্য হুড়াহুড়ি করছিল। এমনকি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পর্যটকদের জন্য

মাটি খুঁড়ে বের করা আংটি, খোদাই করা পাথরের টুকরা, অলঙ্কার রাখার ভাঙ্গা মাটির পাত্র ইত্যাদি নিয়ে রাস্তার পাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যটকদের পিছু পিছু দৌঁড়াচ্ছিল আর চীৎকার করে বলছিল, 'ভান ডালের, টু ডালের।'

আমি ভাবলাম এত পথ পাড়ি দিয়ে যখন এসেছি, তখন কিছু সুভ্যেনির আমারও কেনা দরকার। ওখানে সোনালি চুলের প্রায় দশবছর বয়সি একটা মেয়ে, হাতে একটা মৃৎপাত্রের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল আর ওর পাশেই মানুষের মাথার আকৃতির নীল রঙের একটা পাথরখণ্ড নিয়ে একটা ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ভাবলাম ঐ নীল পাথরটা হয়তো কোন একটা আংটির পাথর হবে।

আমি বললাম, 'ঐ দুটো জিনিসের জন্য তোমরা কত দাম চাচ্ছ?'

ছোট্ট মেয়েটি মৃৎপাত্রের জন্য চল্লিশ লিরা চাইল আর ছেলেটা পাথরখণ্ডটার জন্য পনেরো লিরা দাম চাইল। জিনিসগুলো সম্পর্কে কিছু না জানলেও শুধু সস্তায় কেনার জন্য আমি বললাম, 'খুব বেশি দাম চাইছ।'

ছেলেমেয়ে দুটো বড়দের মতো তর্ক শুরু করলো। অবশ্যই এগুলো দামি নয়। তবে ওদের বাবা বেশ কয়েকদিন মাটি খুঁড়ে পাঁচ মিটার নিচে থেকে এগুলো পেয়েছেন।

জিনিসগুলো আমি প্রায় কিনেই ফেলছিলাম, কিন্তু আমার আমেরিকান গালিচাবিশেষজ্ঞ বন্ধুটি বললেন, এগুলোর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য নেই। তারপর তিনি বললেন, প্রাচ্যে যেসব জায়গায় তিনি ঘুরেছেন, সবজায়গাতেই একই অবস্থা দেখেছেন। 'ঠিক একই রকম। প্রত্যেক খনন এলাকায় যেখানে পর্যটকরা যায়, সেখানে ছেলেবুড়ো-মেয়ে সবাই রাস্তায় পর্যটকদের থামিয়ে, হাতের কাছে যা পায় তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদ্রব্য হিসেবে ওদের কাছে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।'

এই ধূর্ত চাষীরা এমন কৌশল করে নকল প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য বানায় যে, বিখ্যাত প্রত্নবিদরাও এগুলো দেখে ধোঁকা খান। এমনকি একবার ওরা মেষপালকের একটা কুকুরের কামানো মাথাও একজন রাজার মাথার মমি হিসেবে একজন আমেরিকান পর্যটকের কাছে বিক্রি করেছিল। তবে প্রতারক চাষীদের হাতে বানানো এই নকলগুলোও অবজ্ঞা করার মতো নয়, যেমন ঐ ছেলেটির হাতের মানুষের মাথার আকারের ছোট্ট নীল পাথরখণ্ডটি ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের কারিগরির একটি নিদর্শন। এধরনের জিনিস বানানো এত সহজ নয়।

ভাড়া করা জিপে আমরা চলছিলাম। ভীষণ গরম। এমন সময় রাস্তার পাশে কয়েকটা পপলার গাছ আর একটা কুয়া চোখে পড়লো। ভাবলাম এই গাছের ছায়ায় বসে লাঞ্চ খেয়ে নিলে হয়। একজন বয়স্ক চাষী গাছের নিচে লম্বা হয়ে শুয়ে ঢুলছিল আর ওর একটু পেছনে একটা গাধা চড়ছিল।

সালাম জানিয়ে আমরা চাষীটার সাথে কথা বলা শুরু করলাম। চাষী যা যা বলছিল, সেসব কথা আমি আমেরিকান ভদ্রলোকটির জন্য ইংরেজিতে তর্জমা করছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আশেপাশের গ্রামগুলোতে কি চাষ হয়?'

সে বললো, 'কিচ্ছু না। আগে আমরা চাষাবাদ করতাম। কিন্তু সেই বিশ বছর আগে যখন খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হল, তখন থেকেই চাষীরা অলস হয়ে পড়লো। এখন ওরা কিছুই চাষ করে না।'

আমেরিকানটি বললেন, 'একই ঘটনা অন্যান্য জায়গাতেও ঘটছে।'

তারপর আমি বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে ওদের চলে কি করে?'

'যেহেতু তখন থেকেই ভাঙ্গা হাড়িপাতিল, পাথরের টুকরা ইত্যাদি খুঁড়ে বের করার একটা স্টাইল শুরু হয়েছিল, তাই চাষীরা চাষাবাদের কাজ বাদ দিয়ে খনন এলাকায় মাটি খুঁড়ে যাই পাচ্ছে, তা ঐ বিদেশিদের কাছে বিক্রি করছে।'

আমেরিকান বললেন, 'একই অবস্থা অন্যান্য জায়গাতেও হচ্ছে।'

চাষীটি বললো, 'আমাদের দেশের লোকেরা খুবই নিচুধরনের। দেশের সব সম্পদ ওরা বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। যেসব পাথরের কলাম আর সমাধি ওরা খুঁড়ে বের করে, এগুলোর আসল মূল্য জেনে যদি ওরা বিক্রি করতো, তাহলে ওরা আরো দশটা তুরস্ক তৈরি করতে পারতো. . . আর যেসব বিদেশীর

কথা আমরা বলছি ওরা সব চোর। প্রাচীন নিদর্শন খুঁড়ে বের করে ওরা চুরি করে বাইরে পাচার করে দেয়।'

আমেরিকানটি বললেন, 'একই ব্যাপার অন্য সব জায়গাতেই ঘটে চলেছে।'

তারপর চাষীটি বললো, 'এখন খুঁড়ে বের করার মতো মাটির নিচে আর কিছুই নেই আর থাকলেও তার কোন মূল্য নেই। সরকার এখন জেগে উঠেছে, এখন ওরা কাউকেই কোন কিছুতে হাত দিতে দেয় না। এখন এই বিদেশিরা যদি কিছু চুরি করে, তবে ওরা তা সরকারের কাছ থেকে চুরি করে, কেননা সরকারেরই এখন এসব জিনিস সঠিক মূল্যে বিক্রি করার কথা।'

আমেরিকান বললেন, ' হ্যাঁ, একই ব্যাপার অন্য জায়গাতেও ঘটছে।'

'তাহলে এখন চাষীদের কিভাবে দিন চলে?'

'এই জায়গাটির আশেপাশে ছয়টা গ্রাম আছে। ওদের বাড়িতে গেলে আপনি কোন বাড়িতেই একটা টুকরা কাপড়, কাচের জিনিস, জগ বা কলসি দেখতে পাবেন না। বাড়িগুলো সব খালি। '

'কেন?'

'কেন মানে? সবকিছু ওরা পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। ওদের বাড়িতে এক চিলতে কাঠও আর অবশিষ্ট নেই। যা কিছু ছিল, সব ওরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। জিনিসগুলো ওরা মাটিতে পুঁতে রাখে, তারপর জং ধরিয়ে এগুলোকে পুরাকীর্তি নিদর্শনে পরিণত করে। কি বলবো, আমাদের লোকদের নীতিবোধ একেবারে নিচে নেমে গেছে। গতকাল একটা ছেলেকে হাতেনাতে ধরে ফেললাম, সে আমার গাধাটার গলায় বাঁধার রশি থেকে পুঁতি চুরি করার চেষ্টা করছিল। একবার হাতে পেলেই জিনিসটা সে মাটিতে পুঁতে ফেলতো, তারপর কি করতো জানেন, মাটি খুঁড়ে জিনিসটা বের করে প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে বিক্রি করতো। বিয়ের বয়সী মেয়েরা সবাই বাড়িতে বসে অতীতের শিল্পকর্ম নির্মাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা যদি হাতের আঙ্গুলের সমান একটা পাথরের টুকরা পায়, তাহলে সেটা খোদাই করে কেটেকুটে এমন একটা শিল্পকর্ম তৈরি করে যা আপনি বিশ্বাস করবেন না। গাধার পায়ের জুতা দিয়ে ওরা মেডেল আর প্রাচীন মুদ্রা তৈরি করে।'

আমেরিকানটি বললেন, 'বলেছি না? ঠিক একই ব্যাপার সব জায়গায় ঘটে চলেছে।'

এবার আমি বুড়ো চাষীটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কিভাবে চলে? তুমি কি কর?'

সে বললো, 'আমি গাধা কেনা-বেচার ব্যবসা করি।'

একথা বলে সে কুয়া থেকে একটু পানি তুলে নিয়ে গাধাটার খাওয়ার জন্য কুয়ার সাথে লাগানো জাবনা-ভান্ডটিতে ঢেলে দিল। গাধাটা যখন পানি খাচ্ছিল, তখন আমেরিকানটি একলাফ দিয়ে উঠে গাধাটার কাছে গেল। এদিকে চাষী আর আমি তখনও কথা বলে চলেছি।

'গাধার ব্যবসায় কি তোমার চলে?'

'আলহামদুলিল্লাহ। এই ব্যবসা করেই আমি পাঁচ বছর চলছি। শুকুর আল্লাহর।'

'ব্যবসা কীরকম হয়?'

'সবকিছু নির্ভর করে গাধার উপর। '

'আচ্ছা একটা গাধা বিক্রি করতে কতদিন লাগে?'

'ঠিক নেই। অনেক সময় একটা গাধা তিন থেকে পাঁচ মাসেও বিক্রি হয় না। আবার অনেক সময় একদিনে পাঁচটা বিক্রি হয়।'

এবার আমেরিকান ভদ্রলোকটি আমাদের দিকে হেঁটে এলেন। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

তিনি বললেন, 'কি আশ্চর্য! গাধাটার গায়ের উপর ঐ গালিচাটা দেখেছেন?'

চাষী আমাদের কথা বুঝতে পারলো না, কারণ আমরা ইংরেজিতে কথা বলছিলাম।

গাধাটার পিঠে একটা পুরোনো, ছেঁড়া, কাদামাখা গালিচা ছিল।

আমি বললাম, 'আপনি কি ঐ ময়লা কাপড়ের টুকরাটার কথা বলছেন?'

তিনি বললেন, 'হায় ঈশ্বর! এটা একটা অপূর্ব জিনিস, একটা মাস্টারপিস। আপনারা যখন কথা বলতে শুরু করেছেন, তখন থেকে আমি জিনিসটা লক্ষ্য করছিলাম। এর রং আর ডিজাইনটা বিস্ময়কর আর বুনটও অবিশ্বাস্য রকমের। এর প্রতি সেন্টিমিটারে ঠিক একশো বিশটা গিঁট রয়েছে। এর আগে পৃথিবীতে এরকম জিনিস আর দেখা যায়নি, এটা অমূল্য।'

আমি বললাম, 'আপনি কি এটা কিনতে চান?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ চাই। তবে আমি চাই না চাষী জানুক যে আমি এই গালিচাটা কিনতে চাই। এদেরকে আমি ভাল করে জানি। আপনি যদি ওদের পুরোনো ছেঁড়াফাটা স্যান্ডেলটাও কিনতে চান, তবে ওরা রাজ্যের টাকা চেয়ে বসে। কারণ ওরা মনে করে এটা অত্যন্ত মূল্যবান এবং একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। আপনি যতই টাকা দিন ওরা কখনও তাতে সন্তুষ্ট হয় না। দাম বাড়াতেই থাকে। সেজন্য আমরা চাষীকে আসল কথাটা জানতে দিতে চাই না।'

ঠিক তখন চাষী বললো, 'হড়বড় করে ঐ কাফেরটা কি বলছে? আপনারা দুজনেই অনেক্ষণ ধরে কেবল বকর বকর করে চলেছেন।'

আমি বললাম, 'কিছু না। সে এ জায়গাটা বেশ পছন্দ করেছে।'

'এখানে পছন্দ করার কি আছে? শুধু কতগুলো চুনাপাথরের ন্যাড়া পাহাড় ছাড়া আর কি আছে।'

এবার আমেরিকান বললেন, 'আমি আপনাকে বলেছি না, এসব জিনিস সস্তায় কেনার আমার একটা পদ্ধতি আছে? এবার দেখুন সেই পদ্ধতিরই একটা এবার কাজে লাগাচ্ছি।'

'কি?'

'আমি এমন ভাব দেখাব না যে, গালিচাটার প্রতি আমার কোন আগ্রহ আছে। আমি গাধাটা কিনতে চাইবো। স্বভাবতই চাষী গালিচাটার মূল্য জানে না, কাজেই আমরা যখন গাধাটা কিনবো, তখন সে গালিচাটা ওটার পিঠেই ফেলে রাখবে। তারপর আমরা গালিচাটা নিয়ে রাস্তায় একটু এগিয়ে গাধাটাকে ছেড়ে দেব। এখন আপনি চাষীটিকে বলুন যে, আমি গাধাটা কিনতে চাই।'

আমি চাষীকে বললাম, 'তুমি গাধাটা বিক্রি করতে চাচ্ছিলে না?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, চাই।'

'আচ্ছা কত দামে যেন এটা বিক্রি করতে চাচ্ছিলে?'

'সেটা নির্ভর করে ক্রেতাটি কে তার উপর।'

'ধর আমরা কিনতে চাই।'

সে হেসে উঠলো।

'আপনি কি আমার সাথে মশকরা করছেন? আপনাদের মতো ভদ্রলোক একটা গাধা নিয়ে কি করবেন?'

'তাতে তোমার কি? আমরা গাধাটা কিনতে চাই। এখন বল দাম কত?'

'আগেই বলেছি। এটা নির্ভর করে কে ক্রেতা তার উপর। এখন বলুন গাধাটি কি আপনি কিনতে চাচ্ছেন, নাকি ঐ কাফেরটা?'

'না, তিনি কিনতে চান।'

'লোকটা কোন দেশি?'

'আমেরিকান।'

'হুমম, দেখুন স্যার, গাধাটা খুব বুড়ো আর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে বলুন এটা তার কোন কাজে আসবে না।'

কথাগুলো আমি আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে বললাম।

তিনি বললেন, 'ভাল, ভাল। তার মানে সে সস্তায় এটা বিক্রি করবে।'

'এটা বুড়ো হোক বা না হোক, তাতে ওর কিছু আসে যায় না।'

'একজন আমেরিকানের সাথে এরকম কাজ করাটা লজ্জার ব্যাপার হবে। দেশে গিয়ে উনি বলবেন তুর্কিরা তাকে ঠকিয়েছে।'

কথাটা আমি আমেরিকানকে বললাম।

তিনি বললেন, 'তুর্কি চাষীরা অত্যন্ত সরলমনা এবং সৎ। অন্য কোথাও হলে সাথে সাথে ওরা জিনিসটা আমার কাছে বিক্রি করে দিত। যেহেতু সে একজন ভাল মনের মানুষ কাজেই তাকে আমি অনেক টাকা দেব।'

আমি চাষীকে বললাম, 'আমেরিকান রাজি।'

সে বললো, 'কিন্তু স্যার, আমেরিকায় পৌঁছার আগেই পথেই এই গাধাটা মারা যাবে। তাছাড়া এর সারাগায়ে চর্মরোগ।'

'তাতে তোমার কি। তিনি এটাই চান।'

'আল্লাহ, আল্লাহ, এটাতো মাদিও নয় যে তার কাজে আসবে। এই বুড়া, দুর্বল গাধাটা নিয়ে তিনি কি করবেন?'

'তাতে তোমার মাথা ঘামাবার কি দরকার। তুমি শুধু টাকার কথা ভাব। এখন বল এই গাধাটার জন্য কত চাও?'

চাষীটি বললো, 'আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে। আপনি কেবল এই আমেরিকান এফেন্দিকে জিজ্ঞেস করুন, 'ওদের দেশে কি কোন গাধা নেই?'

সে জিজ্ঞেস করছে, ' আপনার দেশে কি কোন গাধা নেই?'

খানিক্ষণ ভেবে আমেরিকান ভদ্রলোকটি বললেন, 'তাকে বলুন আছে, তবে এরকম গাধা নেই।'

কথাটা চাষীকে জানালাম।

'হুমম, তার মানে আমেরিকান গাধা তার পছন্দ নয়, তিনি তুর্কি গাধা পছন্দ করেন। ঠিক আছে, আমার আর করার কি আছে? গাধাটার যা যা দোষ আছে সব আমি খুলে বলেছি। তবে একজন বিদেশি এতদূর পথ পার হয়ে দুর্বল একটা গাধা কিনতে এসেছেন, তার মনে আমি কষ্ট দিতে চাই না। ঠিক আছে আমি বেচবো।'

'কত বল?'

'শুধু আপনার জন্য দশ হাজার।'

'কি! তুমি কি পাগল হয়েছ? একটা চমৎকার তেজী আরবি ঘোড়াও দুই থেকে তিন হাজার লিরায় পাওয়া যায়।'

'তাহলে গাধা নিয়ে আপনার কাজ কি? তাকে বরং একটা তেজী আরবি ঘোড়া কিনতে বলুন।'

এরপর যখন আমেরিকানটিকে বললাম সে দশ হাজার লিরা চাচ্ছে, তখন তিনি বললেন, 'বলেছিলাম না? এরা এরকমই হয়। ওরা অনেক টাকা চায়, কারণ ওরা মনে করে জিনিসটা মূল্যবান। যদি আমরা গালিচাটা কিনতে চাইতাম,

তাহলে সে একলক্ষ লিরা চাইত। গাধাটার জন্য আমি দশ হাজার লিরা দিতে পারি, তবে আপনাকে শক্ত হয়ে দরকষাকষি করতে হবে।'

আমি চাষীটিকে বললাম, 'আচ্ছা সত্যি বলতো, এই গাধাটার জন্য তুমি কত দিয়েছ?'

সে বললো, 'আমি মিথ্যা বলি না। নামাজ পড়ার জন্য এই মাত্র ওজু করেছি, তাই এখন মিথ্যা বলবো না। চামড়া ছিলে স্যান্ডেল বানাবার জন্য গাধাটা পাঁচ লিরা দিয়ে কিনেছি। এটা মরে গেলেই আমি এর চামড়াটা ছাড়িয়ে নেব। আর কোন কাজে সে আসবে না।'

'শোন, ন্যায্য কথা বল! যে গাধা তুমি পাঁচ লিরায় কিনেছ, কেমন করে সেটা দশ হাজার লিরায় বেচার কথা বলছো?'

'দেখেন বাবা, আমি তো এটা বিক্রির কথা বলিনি, আপনারাই কিনতে চাচ্ছেন। আমি বললাম এটা বুড়া হয়ে গেছে, অথচ তিনি বললেন ঠিক আছে। আমি বললাম এর গায়ে চর্মরোগ আছে, উনি তা মেনে নিলেন। আমি বললাম এটা মাদি নয়, তাও উনি এটা চাচ্ছেন। আমি বললাম, এটা আর একদিনও টিকবে না, উনি তবুও বললেন, ঠিক আছে। ওহ, ভাল কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম. . . গাধাটার একটা পা খোঁড়া। এটা ডান পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।'

'এতে কিছু আসে যায় না।'

'তাহলে আপনি দেখুন, এই গাধাটার মধ্যে এমন কিছু মূল্যবান বা এমন কোন গুণ আছে, যা আমি জানি না। আর নয়তো কেন এই আমেরিকান কাফেরটা এই চর্মরোগে ভরা, বুড়া আর খোঁড়া গাধাটা কিনতে চাইবে? দশ হাজার, এর কমে হবে না!'

এরপর দুই ঘন্টা ধরে দর-কষাকষি চললো। বেশ কয়েকবার আমরা এমন ভাব দেখালাম যেন আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি এবং হেঁটে একটু দূরে চলে এলাম। কিন্তু সে তা খেয়ালই করলো না। আবার আমরা ওর কাছে ফিরে এলাম।

সে বললো, 'জানতাম আপনারা ফিরে আসবেন।'

যাইহোক অনেক দরকষাকষির পর অবশেষে আড়াই হাজার লিরায় নিষ্পত্তি হল। টাকা গুণে আমরা ওর হাতে দিতেই চাষী গাধার পিঠের উপর থেকে কাপড়ের টুকরাটা তুলে নিয়ে গাধার গলার রশিটা আমাদের হাতে তুলে দিল।

আমেরিকানটি চাষীর হাতে ধরা কাপড়টার দিকে তাকিয়েছিলেন। এখন আমরা কি করবো?

তিনি বললেন, 'সাবধান, এখন কিছু বলবেন না। আমরা গাধাটাকে নিয়ে কিছু দূর এগোব, তারপর আবার ফিরে এসে বলবো, 'সর্বনাশ। গাধাটার পিঠে

তো ঠাণ্ডা লাগবে। ঐ কাপড়টা দিন, ওটা দিয়ে ওর পিঠ ঢেকে দেব।' তবে সাবধান, লোকটা যেন টের না পায়, আমরা আসলে ঐ কাপড়টার জন্য এসেছি।'

দু'জনে মিলে টেনে হিঁচড়ে দুর্বল গাধাটা নিয়ে বিশ-ত্রিশ কদম যেতেই পেছন থেকে চাষীর গলা শোনা গেল, 'থামুন, থামুন, আপনারা গাধার এই জিনিসটা নিতে ভুলে গেছেন।'

ইশ! তখন যদি আপনি দেখতে পেতেন, আমেরিকান লোকটা কিরকম খুশি হয়েছিল ভেবে যে, কাপড়টা নিজে নিজেই তার কাছে চলে এসেছে।

চাষী বললো, 'এই যে সাহেব। আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার পর গাধাটাকে কিসের সাথে বাঁধতেন? কথাটা একবারও ভাবেননি। খুঁটি ছাড়া কেউ কোন গাধা কিনে না। '

তারপর আমরা লোকটার হাত থেকে আংটাসহ গাধা বাঁধার লোহার খুঁটিটা নিলাম।

এবার আমেরিকানটি আমাকে বললেন, 'এখনই সময় হয়েছে গালিচাটার কথা বলার। তবে বেশি কিছু বলবেন না, শুধু বলুন, 'ঐ ময়লা কাপড়টাও দাও, ওটা আমরা গাধাটার পিঠে দেব।'

আমি চাষীটিকে বললাম, 'গাধাটা খুবই রোগা। এর গায়ে ঠাণ্ডা লাগলে ব্যাপারটা খারাপ হবে। ঐ কাপড়টা দাও। ওটা দিয়ে গাধাটার পিঠ ঢেকে দেব।'

সে বললো, 'না তা হয় না। কাপড়টা আপনাদেরকে দিতে পারি না। আপনারা আমার কাছ থেকে শুধু গাধাটা কিনেছেন, কাপড়টা নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে আমরা গাধাটা কিনেছি। এখন এর গায়ে কাপড়টা দিয়ে ঢেকে দিলেই হয়। তাছাড়া কাপড়টা তো বেশ পুরোনো আর ময়লা, এর তো এক পয়সাও দাম হবে না।'

'হ্যাঁ, এটা পুরোনো আর ময়লা আর এক পয়সাও দাম নেই। তবে আমি এটা দেব না।'

'কেন?'

'দেখুন মিস্টার, এটা আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো না। এই কাপড়টা আমার বাবার কাছ থেকে পুরুষ পরম্পরাক্রমে পাওয়া একটা পারিবারিক সম্পত্তি। এটা আমি আপনাদেরকে দিতে পারি না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ নোংরা কাপড়ের টুকরাটা দিয়ে তুমি কি করবে?'

চাষীটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, 'কি করবো মানে? আরেকটা রুগ্ন গাধা কিনে ওটার পিঠে এই কাপড়টা বিছিয়ে দেব। যদি আমার কিসমত হয়, তবে আমি

আরেকজন লোক পাব যে এটার প্রতি আগ্রহ দেখাবে। আর আল্লাহর রহমতে আমি তার কাছেও এটা বিক্রি করবো। জানেন, এই কাপড়টা আমার সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। খুঁটিটাতো বিনামূল্যে দিলাম। এব্যাপারে কি কিছু বলেছি?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। শোন কয়েক পিয়াস্ত্রা দিয়ে কাপড়টা আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও, এটা দিয়ে গাধাটার পিঠটা ঢেকে দেই।'

'ভাল কথা বললেন! তাহলে আমি কিভাবে গাধা বিক্রি করবো? শুধু এই কাপড়টার সুবাদে গত পাঁচ বছর ধরে আমি, বুড়ো আর রুগ্ন গাধা বেঁচে চলেছি। এখন আমি বিদায় নিচ্ছি।'

আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমেরিকান ভদ্রলোকটির হয়তো হার্ট এটাক হবে। আমি তার হাত ধরলাম।

কয়েক পা যাওয়ার পর চাষী চেঁচিয়ে বললো, 'গাধাটাকে যদি ছেড়েই দিতে হয়, তবে বেশি দূর টেনে নিয়ে কষ্ট করার দরকার কি?'

আমরা গাধাটাকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে জিপের দিকে হেঁটে চললাম।

আমেরিকান গালিচা বিশেষজ্ঞ বললেন, 'এই ধরনের ঘটনা আমার সাথে আর কখনও ঘটেনি। বাকি সবকিছু অন্য জায়গাতেও একই রকম, তবে এটা একটা ভিন্ন ধরনের চাল।'

আমরা জিপে চড়ে বসলাম। খুঁটিটা তখনও তার হাতে ছিল। তিনি এটা ফেলে দিতে পারেননি।

আমি বললাম, 'লোহার খুঁটিটা নিয়ে কি করবেন?'

তিনি বললেন, 'আমার গালিচার সংগ্রহের সাথে এটাকে একটা সুভ্যেনির হিসেবে যোগ করবো। এই খুঁটিটা অত্যন্ত মূল্যবান। এটা সস্তায় আড়াই হাজারে কিনেছি।'

'দেখলেন? সারা দুনিয়ার কাছে আমার কি অপমান হল। ধিক আমাকে।'

তারপর তিনি বার বার, 'কি লজ্জার কথা, কি লজ্জার কথা' বলতে বলতে কপাল চাপড়াতে লাগলেন।♦

গ | ল্প |

দাদন আলীর চুরিবিদ্যা ও জীবনের কলকব্জা

জব্বার আল নাঈম

০১.

ও পদধাইন্যা সাব, ঘরে আছেন নি?

বাসুনি ডাকছ?

হ পদধাইন্যা।

আইজ্জা বাজারে যাইবেন না?

বুঝত্যাছি না। আসমানের মোন বালা না, মেঘ আইতে পারে। ইদানীং শরীলডাও বালা যাইত্যাছে না। বাইর অইতেও মোন চায় না। তয় তোমার কতা কও। মেঘ–বিষ্টি দিয়া আইলা, কোনো সমস্যা অইছে নি আবার?

পদধাইন্যা সাব, সমস্যা আর কী, হয়তো হুনছেনই, গ্যাছে কাইলক্যা রাইত আমার মুরকার খোয়ারসহ চুরি অইয়া গ্যাছে।

চোর ধরছস নি?

পারলাম না তো।

তইলে ক্যামনে অইব? দ্যাশটাত যে কী আরম্ভ অইছে! পোলাপাইন এত বাড়া বাড়ছে। গিরস্থ সুখে থাকব ক্যামনে?

চোর পাইলে তো হাইল্লাইয়া হালাইতাম। তহন কী আর বিচার চাইতাম? আম্নেরা বিচার করনের লই আইয়্যা পততেন।

বাসু, তুই ত চোর ধততে পারছ না। তইলে আন্তাইজ্যা কারে ধইরা বিচার করুম। অহন ঠান্ডা থাক। মফিজের পোলাপাইনগরে জিগামু। শালমের পোলারা ইদানীং উতরাইয়া গ্যাছে। হুনছি চুরিচোট্টামি করে। কাগোরে সন্দেহ অয়নি তোর?

অনেকরে অয়। কাক্কনের পোলা মন্টু কামডা করছে। আমার ছোডো মাইয়্যাডারেও স্কুলে যাওন-আওনের পোথো ডিসটাব করে। সোহেলের ভাইয়েও কত্তে পারে।

(দাদন আলী মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দেয়) এইগুলো সব অজাত। জাতে উঠব না আর। তুই কোনো কতা কইছ না। অহন কই যাবি যা। আমি জিগগামু।

পদধাইন্যা সাব, বিচার দিয়া গ্যালাম। বিচারডা বালা বালা যেন পাই। নাইলে কিন্তু খুনখারাবি অইয়া যাইব কইলাম।

যা যা। কইলাম তো জিগগামু।

ছাতা মাথায় বাজারের দিকে যায় বাসু। দাদন আলী জানালার কাছে বসে। দাদনের স্ত্রী আয়াতুননেছা ছনের পাতলা মাথায় দিয়ে দক্ষিণের ঘরের উত্তরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। ডাক দেয়, ও আজগরের বাপ, আজগর মোবাইল করছিল, দুই-এক দিনের মইধ্যে তিন আজার টেআ পাডাইতে অইব। আগামী সাপ্তায় পোলার ছেমিস্টার পরীক্ষা চালু।

আজগর কোন সোমায় ফোন দিছিলম আয়াতু? (দাদন আলী স্ত্রী আয়াতুননেছাকে ভালোবেসে 'আয়াতু' বলে ডাকে।)

মেঘের সোমায়। হেই লইগ্যা কথা বুঝি না। কইছে আন্নেরে মোবাইল করব।

আইচ্ছা, কতা কমুনি। আমারে মোবাইলডা দিছ।

মোবাইল হারা দিনই দেওন যাইব। কতাও কইতেন পারবেন। টেআ রেডি কইরা রাইখ্যেন।

দাদন আলীর ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় ভালো। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে স্কলারশিপ পেয়েছে। দশ গ্রামেও এমন ভালো ছাত্রছাত্রী নেই। এলাকার মানুষ বলাবলি করে। বড় দুজন এসএসসি ও এইচএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। পরের দুজনও ভালো করবে। সন্তানের খারাপ ফলাফল বাবা-মাকে যেমন চিন্তায় রাখে, ভালো ফলাফলও চিন্তায় রাখে। তখন ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াতে হয়। বেশি টাকা খরচ করতে হয়। আগামী মাসে ছোট মেয়ে নাজেয়ার এসএসসি পরীক্ষা শুরু। দুই মাস পর লায়লার আইএ। নাঈমার খরচ পাঠানো হয়নি। শত চিন্তা মাথায় করে ভাত খেতে বসে দাদন। খাবার শেষে লণ্ঠন হাতে যায় জোড়পুল বাজারে দিকে। দেখা হয় ভীমরাজের ছেলে মন্তাজের সঙ্গে। চাচা, কই যান?

মন্তাজ নিরে?

হ চাচা।

তুই যাস কই?

বাবুলের দোহানের এক কাপ রং চা খামু।

দিনকাল কেম্নে কাটত্যাছে তোর? কামকাইজের খবর আছে নি?

বৃষ্টির দিন কামকাইজ থাহে না। চলতে কষ্ট অয়, মাতব্বর।

আমগ জীবনডা খুব কষ্টের রে মন্তাজ। কোনো কিচ্চুই অয় না।

আম্নেরা বড় লোক, কিয়ের কষ্ট?

(দাদন আলী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে!) হ রে মন্তাজ, আমরা কোনো রহম চলতে পারি। চিন্তাডা তোগোরে লইয়া।

পদধাইন্যা সাব, কামকাইজের ব্যবস্থা কইরা দ্যান। পোলাপাইনগোরে য্যান বাঁচাইত্যাম পারি।

আইচ্ছা, আইজগ্যা রাইত হারিসুলের লগে গতর খাটতে পারবি নি? টেআপয়সা কাম অওনের পর পাবি।

এইডা আবার ক্যামইনা কাম?

দরকার নগদ টেআ।

বইয়্যা না থাইক্কা সময়ডা হারিসুলের লগে দে। কামে লাগব। দুইডা পইসাও আইব। বাহি থাকলে খোঁজতেও পারবি।

সোময় দিলাম। কিন্তু কামডা কী?

এত কতা অহন কওন যাইব না। যাওনের পর দেখবি। মানুষ মারনের কাম দিমু না।

০২.

মধ্যরাত। সুনসান। বদরপুর ও কাশিমপুর নামক গ্রাম দুটি অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। পশুপাখির কু কা নেই। জোড়পুল বাজারের দোকানিরা ঘুমে আচ্ছন্ন। কর্মপাগলেরা নতুন দিন শুরুর অপেক্ষায়। হারিসুল ও মন্তাজ পূরণ গ্রামের রাস্তার মাটি কাটছে। বৃষ্টিও নামছে অন্ধকার ভেদ করে। দাদন আলী ছাতা মাথায় বসে আছে। জানতে চায়, ও হারিসুল, কোনো খবর টবর অইলনি?

পাইত্যাছি না। কূলকিনার নাই। মেঘ-বৃষ্টি দিয়া কাম করতে ম্যালা কষ্ট। মালডা পাইয়া গ্যালে কষ্ট লাগত না।

মন্তাজে কই?

আছি।

আছে নি কিচ্ছু?

পদধাইন্যা, বুঝতাম পারছি না। আরোকটু চেষ্টা কইরা দ্যাহন যায়। মনে লইত্যাছে কিচ্ছু নাই। হুদাই কষ্ট করত্যাছি।

ও হারিসুল, মন্তাজে কয়ডা কী?

মাতব্বর, কতা মনে হয় মিছা না। নামগোন্ধও নাই।

পাবি পাবি। আরোকটু কষ্ট কর। পাইলে কপাল খুলব। সাতপুরুষ বইয়্যা খাইবি। ধর ধর সিগ্রেট টান।

দাদন আলী টর্চের আলোতে দুজনের দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিলে, অবিশ্বাস নিয়ে হাত বাড়ায় মন্তাজ। আবার পিছিয়ে নেয়। আবার সামনে ঠেলে দেয়। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছে না দাদন আলী। মন্তাজ ভাবছে, অন্ধকারে প্রকৃত দাদনকে চেনা যায় না। এই দাদন নিশ্চিত মাতব্বর দাদন আলী নয়।

মন্তাজ, সিগ্রেট টানলে শরীলডা গরম অইব।

তবু অন্ধকারে লুকোচুরির ভঙ্গিতে ভেজা সিগারেট জোরে টান দেয় মন্তাজ।

হারিসুল টানতে টানতে বলে, পদধাইন্যা সাব, আইজ আমার কিচ্ছু টেআ লাগব।

কত?

কম কইরা অইলেও পাশ শ।

অন্ধকারে মাথা নাড়ে দাদন। টেআর লইগ্যাই কষ্ট করত্যাছি। কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে। বুঝছ হারিসুল?

আগে তো বাঁচন লাগব। না বাঁচলে কষ্ট করুম ক্যামনে?

বাঁচবি বাঁচবি। পিলারডা পাইলে অনেক টেআ বেচন যাইব। অনেক টেআ ভাগে পাইবি। দুঃখ দূর অইয়া যাইব। আরোক টিপ দম দে। এরপর দেহা না পাইলে যামুগা, কাইল আবার আমু।

হারিসুল ও মন্তাজ পুনরায় কাজে মন দেয়। তাদের ধারণা, বৃষ্টির কারণে অর্ধেক কাজ কম হয়েছে। তার ওপর কোনো সুখবর নেই। দাদন আলী চিন্তা অন্য দিকে নিতে চায়। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতে হবে। ছেলের টাকা পাঠাতে না পারলে বউ ঝগড়া করবে। ঘরের বিবি পকেট দেখে না, পেটের দিকে তাকায় না। দেখে ঘরে খাবার আছে কি না। অন্যথায় বলে, সংসারের খরচ বহন করতে না পারলে বিয়ে করছো কেনো? পোলাপান আনতে গেলে কেনো? ভাবতেই চায় না, সংসার দুজনের। সন্তান দুজনের। পুরুষের চেয়ে নারীই সংসার উপভোগ বেশি করে। যা-ই হোক, টাকা দিতে না পারলে আটকে যাবে ছেলের পরীক্ষা। এই সেমিস্টারটা দিতে পারলে লেখাপড়া শেষ। ছেলেমেয়েরাও জীবনে অনেক কষ্ট করেছে। এমনটা ভাবতে গিয়ে দাদন আলীর চোখ ছলছল করে। দেখতে পায় না মন্তাজ ও হারিসুল। মাতব্বরের চোখে পানি, এমনটা করা যাবে না। দাদন দ্রুতই মুছে ফেলে পানি।

মন্তাজ মাটি সরাতে সরাতে বলে, হারিসুল, আইজ্যা আর পারুম না। কাইল বাকি কাজ করুম। জীবনে এত কষ্ট করি ক্যাবল পোলাপাইনগো মুহে কয়ডা খাওন দ্যাওন লাগব বইল্যা। নাইলে বালের কষ্ট করনের মানুষ মন্তাজ না।

হারিসুলের মন খারাপ। দাদন আলী মাতব্বর মন খারাপের ভেতরেও মৃদু হাসার চেষ্টা করে। সারা জীবন বুকের কান্না লুকিয়ে মুখে হাসে।

মস্তাজ বলে, ঘরে চাইল নাই। বউ পোলাপাইনের মুখে কী দিমু?

দাদন আলী বলল, বিষ তো আর দিতে পারবি না, তয় মুখে ভাত দিবি।

কই থেইক্কা দিমু?

এত কান্দাকাডি করছ ক্যান। ভাতের ব্যবস্থা অইব। অহন কোনাইচ্চা পোথ দিয়া আয়। গরিবের লগে যেই কাম কত্তে যাই আগে টেআর কতা কয়! বিপদের লগে বিপদ।

পদধাইন্যা, বিলে প্যাক পানি। আডন যাইব না।

যাইব, পাও মাথাত লইয়া আয়, মিজি বাইড় উপ্রে দিয়া যামু।

হারিসুল জানতে চায়, এত রাইত কিল্লাই যামু?

তোগো টেআ লাগব না?

লাগব। মিজি বাইত টেআর খনি আছে?

তইলে লন। যামু।

০৩.

আমার সর্বনাশ অইয়া গ্যালো রে। সর্বনাশ অইয়া গ্যালো। মালেক মিজি চীৎকার করছে। বাড়ির উঠানে দাদন আলী মাতব্বর। উঠান ঝাড়ু দেয় দাদনের স্ত্রী। মেয়ে লায়লা ও নাজিয়া পড়ার টেবিলে। মালেকের কান্না শুনে উঠে আসে। ও মালেক চাচা, কী অইছে?

আর কইয়েন না, আমার বড় গরু দুইডা আইজ রাইত চোরে লইয়া গ্যাছে। অহন কী করুম! বাঁচুম ক্যামনে? দাদন চাচায় কই? চাচায় এলাকার মাতব্বর,

গরু দুইডার খোঁজ লইত পারেনি, কন। আর না অইলে আমি পোলাপাইন লইয়া বাঁচুম ক্যামনে? মরণ ছাড়া উপায় নাই। পথে বইয়া ভিক্ষা করন লাগব। চাচার কতা দশ গ্যারামের মাইনষে হুনে, চোরেরা হুনব না ক্যান?

মালেক মিজির চেঁচামেচিতে মানুষের জটলা তৈরি হয়।

দাদন মাতব্বরের ঘুম ভাঙে। ভিড় ঠেলে কাছে আসে চোখ ঘষতে ঘষতে। কী অইছে রে মালেক?

আমার গরু দুইডা চুরি অইয়া গ্যাছে, মাতব্বর।

গরু রাইখ্যা, আত-পাও ছাইড়া মরণের মতন ঘুমাইয়া থাহছ ক্যান? এতবার বলনের পরেও তোরা সোজা অইলি না। কাইল বাসুর মুরকা চুরি, পরশু ছাদেক বওয়ালের ছাগল চুরি, আইজ তোর বলদ চুরি। পরের দিন আমার ঘরে হিন দিয়া মাইয়াগোরে চুরি করব। ছ্যারাব্যারা থাকলে চুরি তো বাড়বই। অহন থেইক্কা হগ্গলে মিল্লা রুইক্কা খাড়নের দরকার। কিন্তু তোরা করবি না। মিইল্যা-মিইশ্যা থাকবি না। অহন বাইত যা। যাইয়া রেডি অ। আইজ রইবার, নারাণপুর বাজার বইব। আমিও আইতাম পারি। দেহি তোর গরু কেউ বাজারে উডায় নি। বাজারে গ্যালে পাওনের সোম্বাবনা আছে। এরপর সন্ধ্যায় জোড়পুল বাজারে সব্বাই মিইল্যা বমু। এইডার একটা বিহীত করণ লাগবই। অ নাঈমার মা, চোক বড় কইরা চাইয়া আছো ক্যা? নাস্তা-টাস্তা আছে নি কিছু? মালেক রে দ্যাও।

রুডি আছে চাইরডা।

দুইডা মালেক রে দ্যাও। দুইডা আমারে।

আমি অহন কিচ্ছু খামু না, পদধাইন্যা। মরইন্যা মাইনষ্যে কিচ্ছু খায় না। আমি মইরা গ্যাছি। আন্নেগো লগে কথা কয় আমার রু। খাওন আমনেই খান। এরপর উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে মালেক মিজি। বাড়ির দিকে যাবে। হাঁটছে অনেকটা আলাভোলা। হাঁটার দৃশ্য দেখছে দাদন মাতব্বর। মালেকের জন্য কষ্ট হয়। ভেতরটা হু হু করে কেঁদে ওঠে, সংসার চালাবে কী দিয়ে? কে তাকে সহযোগিতা করবে? গরু দুটি হারিয়ে পাগল হয়ে যেতে পারে মালেক।

দাদন আলীর সামনে নাস্তা দেয় লায়লা। বেলা কয়ডা বাজছে? অহন রুটি খামু? ভাত অইলে ভালা অইত না?

আব্বা, তরকারি নাই। নাস্তা কইরা বাজারে যান, তরকারি পাডান।

এত বেলা পরে তরকারি পামু? আমারে আগে ঘুম থেইক্যা জাগাইলি না ক্যান? কথাগুলো বলতে বলতে দাদন রুটি খায়। খাওয়া শেষে লায়লাকে ডাকে। তোর মা কই?

মায় ঘাটকুলের ধারে গ্যাছে মোনে অয়।

কাঁচাবাজার কী লাগব?

আন্নে কই যাইবেন?

নারাণপুর বাজার। আওনের সোময় বাজার কইরা আমু।

আব্বা, নারাণপুর বাজারে কী কাম? জোড়পুল বাজারেই সব পাওন যাইব।

বেশি কথা কইছ না। বাজারের ব্যাগডা দে। তোগো কতাবার্তা ভাল্লাগে না।

ব্যাগ আমার লগে নাই। মায় আইয়ুক। এরপর যাইয়েন।

তইলে থাক, কাইল বেহানে জোড়পুল থেইক্কা বাজার করুম। তোর মারে কইছ, আজগরের টেআ পাডানোর ব্যবস্থা করুম। তোগো টেআপয়সারও মিল করুম। তোরা মোনোযোগ দিয়া পড়। পড়া শ্যাষ কইরা চাকরি শুরু করলে সংসারো আর অভাব থাকব না। তহন তোরা টেআ দিবি আমি বালা বালা বাজার করুম। টেআ না থাকলে সম্মান থাহে না রে মা। অহনকার দিন টেআপয়সা লাগে। টেআপয়সার লগে মান-সম্মান জড়াইয়্যা গ্যাছে। আমার সম্মান আছে টেআ নাই। হুন, মান-সম্মানের লগে চলার মতো কিছু টেআ লাগে।

আব্বা, আন্নে দোয়া কইরেন।

সব দোয়া তোগো লইগ্যাই করি। আইচ্চা তোরা লেহাপড়া করছ, কতাবার্তা অট্টু শুদ্ধ কইরা ক।

শুদ্ধ কইরা কইলে ত বুজবেন না, আব্বা। তহন কী অইব?

চেষ্টা করুম। চেষ্টা করতে করতে এক সোময় ঠিকই বুঝুম।

আইচ্চা, অহন থেইক্যা শুদ্ধ কওনের চেষ্টা করুম। হি হি হি...

বাজারে মালেকের গরুর সন্ধান মেলে না। মালেকের ইচ্ছে হয় জোরে চীৎকার করে কাঁদতে। পারে না। কান্নাকাটি করলে মানুষ কী ভাববে? বলদ দুটি পাওয়া গেল না। হারানো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মাইকিংও হয়েছে। তা-ও খোঁজ মেলে না। বাড়িতে বউ-মেয়েদেরও মন খারাপ। গলায় ফাঁসের রশি কেনার কথা ভাবছে মালেক। পোলাপানের মুখে খাওন না দিতে পাল্লে মরণ বালা। মইরা যামু। বাঁচনের আর শখ নাই। ভাই, গলায় ফাঁস দ্যাওনের কোন দড়িডা বালা অইব?

দোকানি হাসে। হাসতে হাসতে বলে, যেইগুলো দিয়া ফাঁস দিলে আন্নে কষ্ট পাইবেন না, তাড়াতাড়ি মরবেন। এই রহম দড়িও আছে। কয় টেআর মইদ্যে দড়ি নিবেন?

ভাই রে, দড়ি একটা ব্যাছনের লইগ্যা এত্ত কথা কন ক্যা?

চাচা, ও চাচা, আন্নের কী কোনো সমস্যা অইছে?

আন্নেরে ভাই কই আন্নে আমারে চাচা কন, এইডাই মেইন সমস্যা!

চাচা, আন্নের মেজাজ গরম ক্যা হেইডা কন?

আমার দুইডা গরু চুরি অইয়া গ্যাছে। অহন মরা ছাড়া উপায় নাই।

অ্যাঁ। মরার আগে কী খাইবেন কন তো?

আগে তোরে খামু। পাগলের মতো প্রলাপ বকতে শুরু করে মালেক। শুক্রবার ডাকের বাজার। অনেক লোকের সমাগম। মালেক মিজি লুঙ্গি খুলে বাজারে হাঁটে। গালাগালি করে। ছোট ছেলেমেয়েদের মারতে যায়। কামড় দেয়। এ নিয়ে বাজারে মারামারিও লেগে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। বাড়ি ফেরে না মালেক। মালেকের ফেরার অপেক্ষায় থাকে তার পরিবার।

০৪.

কয় দিন ধরে দাদন আলীর শরীর আগের মতো সায় দেয় না। বয়স বাড়লে যা হয়। সন্ধ্যার পরপর বাড়ি চলে আসে। স্ত্রী আয়াতুননেছাকে ডেকে হাতে পাঁচ শ টাকার বান্ডিল দেয়। টাকা দেখে অবাক! এত টেআ! কই পাইছেন, আজগরের বাপ?

একজোনের কাম কইরা দিছিলাম। হ্যায় দিছে। পোলামাইয়াগো লাগব। খুব বিপদের সোময় টেআডা পাইচি। উপকার লাগব। ভুল বুইজ্যো না, বউ।

ভুল বুজুম ক্যা? কত দিন পর এত ট্যাহা দেখলাম। আইচ্ছা, আম্নের চেয়ারা এত কালা অইছে ক্যান?

কয় দিন কম ঘুম অইছে। ঠিক অইয়া যাইব!

আজগরের বাপ, চিন্তা বেশি করেন?

সংসারডা তুমি চালাও। তহন চিন্তা করুম না। মুখটাও কালা থাকব না। অহন যাও, অকটু ঘুমাই।

দাদান আলী আয়নার সামনে দাঁড়ায়। অথচ নিজেকে দেখতে পায় না। ভয় পেয়ে যায়! নিজের সঙ্গে কথা বলে, তুই কই দাদন? তোকে দেখা যায় না ক্যান?

আয়নার ওই পাশ থেকে কেউ একজন বলে, চরিত্র নষ্ট হলে আসল মানুষে ঢাকা পড়ে, দাদন।

সব দোষ টেআর, এই টেআ আমার জীবনডায় অধপতন নামাইচে।

প্রথম জীবনটা অবহেলায় ব্যয় না করলে এখন ভালো থাকতে পারতে। সুযোগের অবহেলা না করলে ভালো থাকতে পারতে, দাদন।

অতীত লইয়া অহন ভাবি না। যা আমারে পোড়াইয়া ক্ষত বাড়ায়। পুরান কতা সামনে আনতে চাই না। অহন আমি বেথ্য। বেথ্য এক বাপ। জানেন, বেথ্য মানুষ অওন বালা। বাপ হওন বালা না। আমার বেথ্যতা ছেলেমেয়েরে ছোডো কইরা দিছে। নাইলে ছেলেমেয়েগো মেধা আরো দূরে য্যাইতে পারত।

তাই বলে মালেকের মতো গরিব মানুষকে খুন করতে হবে?

ধনীগো থেইক্যা উশুল করন যায় না কিচ্ছু। আমার পক্ষে সোম্ভবও না। এই জন্য মালেকেরডা নিছি। শকে চুরি করি না।

এসব কত দিন চলবে, দাদন?

এসব কত্তে চাই না। করলে আত কাঁপে। চোহে আন্ধার দেহি। পাওডায় জোর পাই না। মগজে ঘুত্তে থাহে।

কথাগুলো বলতে গিয়ে দাদন আলীর চোখে পানি আসে। বাঁ হাতে সেই পানি মোছে। কিছুক্ষণের জন্য বুজে থাকে চোখ।

বিহাইন্ড দ্য স্কিনে ঘুমাচ্ছে মন্তাজ ও হারিসুল। দিনের বেশির ভাগ ঘুমিয়ে কাটে তাদের। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে জীবন ও জীবিকার সামান্য পরিবর্তন। বদলে যায় নিজেদের অবস্থান। ঠিকঠাক তিন বেলা খেতে পারছে। ছেলেমেয়েরাও কান্নাকাটি করছে না।

মাইনষের অসহায় ছবি দেইখে আমরা অসহায় হইয়া পচ্ছি। গ্যারামে গ্যারামে যেই হারে চোর বাচ্ছে, বাঁচনডাই মুশকিল অইয়া পচ্ছে! কে কার ডিম তাও দেয়? অহন এইডা বুইজ্যা উঠোনও কষ্টের। চোরে এদদিন হাঁস, মুরগি নিত। অহন নেয় গরু-ছাগল। কয় দিন পর হেজেক লাইট জ্বালাইয়া ডাহাতি করব। তহন কী অইব আমগো? চুরি অইত্যাছে চোর ধরা খাইত্যাছে না। কতা অইল! আক্ষেপ করে বলেন মেম্বার মমিন শেখ।

দাদন আলী বলে, অহনকার চোরেরাও বালা রহমের কৌশল হিক্কা গ্যাছে, মেম্বর সাব। আপনেরা তো জানেন কয় বচ্ছর পুলিশে চাকরি কচ্ছিলাম আমি। ঝামেলার কারণেই চাকরি অইতে চইলা আইলাম। টেনিংয়ে হুনছি ছ্যাঁচড়া চোররা মুরগির সামনে পেইজ কাইট্যা দ্যায়। তহন মুরগি আর ডাহে না। ছাগলের মুহে নুন লাগাইলে ছাগলও ডাহে না। আর গরু তো গরুই। যেমিক্কা টানবেন হেইমিক্কা যাইব। মেম্বর সাব, তহন চোরের চুরি করনডা সহজ অইয়া যায়।

দাদন আলী, আন্নের কতা ঠিক আছে। দেরি করণ আর ঠিক অইব না। আমাগো আতে সোময় নাই। আরোকডা কতা হুইন্যা রাহেন, খেল রাইখেন, গ্যারামের কেউ এমন কামে না জড়ায় য্যান। সাবধান কইরা দিলাম, হেইলে তার বিচার অইব ডবল। গ্যারামের লইগ্যা প্রতিরক্ষা বাহিনী বানামু। এইডার দায়িত্ব দাদন আলী মাতব্বরে দেওন অইল।

মেম্বর, এই দায়িত্ব জোয়ান পোলাপাইনগোরে দ্যান। বালা পারব। আমার বয়স বাড়ছে। পারুম না।

দাদন মাতব্বর, প্রথমবার আন্নেই পালন করেন। পরে জোয়ানগোরেই দিমু। জোয়ানগোও একদিন দায়িত্ব পালন করন লাগব। দাদন মাতব্বর অইব, মমিন শেখ অইব। আগে আমগ থেইক্কা শিখক।

আন্নে কইছেন আর কী করার আছে। নিলাম দায়িত্ব। তয়, লোকজন পিছনে থাহন লাগব কইলাম। মাগার গ্যারামে চুরি অয় কেন্নে চাইয়া ছাড়ুম। শরীলের সবডা দিয়া চেষ্টা করুম। আন্নেরা থাকবেন তো?

উপস্থিত সবাই সায় দেয়। মন্তাজ আর হারিসুল সায় দেয়। ডাক দিলেই বেরিয়ে পড়বে।

০৫.

মালেক মিজিকে রূপগঞ্জের মাজার মসজিদের সামনে থেকে ধরে নিয়ে আসে শহীদুল্লা মিস্ত্রী। দুর্বল হয়ে পড়েছে। পরিচিত-অপরিচিত যাকে দেখে, গরু চোর বলে মারতে উদ্যত হয়। মালেকের স্ত্রীকে শিকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতে হয়। তারও মানসিক সমস্যা হয়েছে। এলাকার মানুষ দেখতে আসে। এমন করুণ কাহিনি দেখে চোখের পানি আটকাতে পারে না। মালেকের স্ত্রী চীৎকার করে বলে, সার্কাস দেখতে আইছেন? সার্কাস! আমি সার্কাস। মালেক সার্কাস। আর তোরা সব্বে গরু চোর।

কিছুদিন হয় এলাকায় চোরের উৎপাত কম। চুরিও কমে এসেছে। শান্তি বিরাজ করছে সবার ঘরে। সবাই কৃতিত্ব দিল দাদন আলীকে। এলাকার মানুষ খুশি দাদন মাতব্বরের ওপর। মাতব্বর বলে, মাইনষের জন্য কিচ্ছু কত্তে পাচ্ছি, এইডা আমার বালা লাগছে। সবে বালা থাকলে নিজেও বালা থাহি। আমগো গ্যারামে আর কোনো চুরি অইব না। লাগে আরো গাড নিয়োগ দিমু। চোর আইতে পারব না। আমি দাদন আলী আছি, সব্বে ঘরের দুয়ার খুইলা ঘুমাইবেন।

দাদনের বড় ছেলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। উচ্চশিক্ষা নিতে দেশের বাইরে যেতে চায়। প্রথম প্রথম দাদনের অমত ছিল। স্ত্রী চায় ছেলে বিদেশে লেখাপড়া করবে। দশ গ্রামের মানুষ জানবে। তাছাড়া এই দেশে চোর-

বাটপার ভরা। ভদ্র মানুষের কাজের পরিবেশ নেই। বাবাও ভরসা দেয়। আজগর জানে খরচ মেটাতে অক্ষম তার বাবা। ছেলেমেয়েদের ফলাফল ভালো হওয়ার কারণে আশপাশের গ্রামের মানুষ দাদন আলীকে চেনে। অর্থকষ্টের কথা কেউ জানে না। মর্যাদাবোধের কারণে প্রতিবেশীর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। মালেক মিজিকে দেখলে চোখ বেয়ে পানি আসে দাদন আলীর। আত্মভাবনায় ডুবলে আত্মমর্যদার কথা সামনে আসে, তখনই আত্মহত্যাপ্রবণ হয় মন। পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা বাড়ে। না পাওয়ার ঘৃণা। বেদনার ঘৃণা। হতাশার ঘৃণা। মানুষকে ঠকানোর অনুশোচনা। আবার সন্তানের কথা ভাবলে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। তারা লেখাপড়া শেষে চাকরি নেবে। কেটে যাবে সংসারের অভাব-অনটন।

কিছুদিন ধরে হারিসুল আর মন্তাজের অর্থকষ্ট আগের মতো বেড়েছে। ধারদেনা করে সংসারের বোঝা টানে। কাজ ছাড়া সংসার চালানো কঠিন। অথচ কেউ কাজ দেয় না। দেশজুড়ে চলছে কাজের সংকট। কর্মহীন থাকলে অভাব বাড়ে। তখন মানুষ অন্যায় করতে দ্বিধা করে না। দুজনই আসে দাদন আলীর কাছে। আমরা অহন কী করুম কন? ঘরে খাওন নাই। পোলাপাইন কান্দাকাডি করত্যাছে।

আমি কী করুম, ক? তোরা তোগো ব্যবস্থা কর। আমারে জ্বালাইস না। না খাইয়া মইরা যামু আমিও। তোরা আইছ না আর। যাহ। হইরা যা। যেমনে পারছ হেমনে গিয়া বাঁইচা খা। সম্মান আর ডুবাইতে পারুম না। দশ গ্যারামের মাইনষে আমারে চিনে। পোলাপাইন বড় অইছে। মাইয়া বিয়া দেওন লাগব। ধরা খাইলে ইজ্জত সবডা যাইব। মালেকেরে দেইখ্যা খারাপ লাগে। মালেকের বউডারে দেইখ্যা চোহের পানি বাইন্ধা রাখতাম পারি না।

মাতব্বর, খুউবই বিপদে আছি। মালেকের থেইক্কা কম বিপদ না। পাগল অইয়া যাইতাম পারি যেকোনো সোময়। পাগলের মুখ বান্ধা থাহে না। তহন আম্নের কথা গোপন থাকব না, কইলাম।

০৬.

চেয়ারম্যান ও মেম্বারের কাছে খোদাইবিল হতে দুজন পত্রবাহক আসে। বাকিলার চেয়ারম্যানের অনুরোধ পত্রবাহকের সঙ্গে সেখানে যেতে হবে। নিজের বাড়িতে যাওয়ার অনুরোধ করেছে। পরামর্শ করে দুজন। মেম্বার বলেন, দাদন মাতব্বর এমন কাজ কত্তে পারে না। হেয় এলাকার আদর্শ।

দুই পত্রবাহক বলে, ফান্দে পড়লে অনেকে ভুল কইরা ফালায়।

চেয়ারম্যান বলেন, অইতে পারে।

আমাগো দেরি করনডা ঠিক অইব না। এলাকার মাইনষে জানার আগে যাইয়া মীমাংসা কইরা আই।

হ, দেরি করনডা ঠিক অইব না। অহনই চলেন।

দাদন আলীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। উঠোনে মস্তাজের লাশ পুরোনো চাদরে ঢাকা। আধমরা হারিসুলও গাছের সঙ্গে বাঁধা। মমিন শেখকে দেখে আধমরা দাদন আলী মাথা নিচু রাখে। কারো মুখে কথা নেই। দাদনের গালে, কপালে আঘাতে চিহ্ন। শার্ট ছেঁড়া ও রক্তাক্ত। চেয়ারম্যান দাদনের সামনে। দাদনের দিকে তাকালেও কথা বলতে পারেন না। দাদন একবারের জন্যও চেয়ারম্যানের দিকে তাকায় না।

দুই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার মমিন শেখ, পুলিশসহ আরো অনেকেই বসে মীমাংসার কথা বলছে। দাদনের কাছে বসেন মমিন শেখ। দাদন মাতব্বর, এলাকার মাইনষে আন্নেরে মানে। কতা হুনে। বিচার–আচারে ডাহে। বিপদ-আপদে পড়লে পরামশ্য চায়। পোলাপাইনগুলিরে মানুষ করত্যাছেন হেই জন্য চাইরপাশে আন্নের সুনাম-সম্মান আছে। আমাগো সমাজেও আন্নের অবদান কম না। এলাকার স্কুলডা আন্নের কারণে অইছে। চেরম্যানের লইগা দিনরাইত খাটছেন। হেয় চেরম্যান অইছে। আন্নে আমারে মেম্বর বানাইছেন। এল লইগ্যা দুই-চাইরজনে চিনে। একবার, কেবল একবার কন, আন্নেরা চুরি করেন না। এলাকাবাসী ষড়যন্ত্র কইরা চোর বানাইয়া বাইন্ধা রাখছে। যত টেআ লাগে আমি খরচ করুম। আইন-আদালতে যামু। খাটুম। আন্নের মান-সম্মান যাইতে দিমু না আর। মানহানির মামলা করুম। সবাই পলাইব তহন। সম্মানডা থাহুক।

মমিন শেখের দিকে তাকায় দাদন আলী। চোখ দুটি লাল। লাল সাগর সাঁতরে কয়েক ফোঁটা পানি আসে চোখের কোণে। পানি ঝরছে। মমিন শেখ,

সাজা আমারে পাইতেই হইব। আমার লই মালেক, মালেকের বউ পাগল অইছে। গ্যারামে গরু, ছাগল চুরি অইছে। এইসব কিল্লুই অইছে, জানেন? সম্মানের কারণে। সম্মান রক্ষা করতে যাইয়া সম্মান হারাইছি। এলাকার মাইনষে আমারে মাইন্যা সম্মান করছে। এল্লুই কোনো কামও করতে পারি না। সালিস-দরবারই করতে অয়। সমাজে সোময় দিতে অয়। এইসবে কোনো রুজি নাই। আবার ঘুষও খাইতাম পারি না সম্মানের কারণে। মাইনষে কইব পদধাইন্যা সাব এমনড্যা কচ্ছে।

আন্নেরা চেয়ারম্যান, মেম্বর অইয়া কী দায়িত্বডা পালন কচ্ছেন? আমি চোর অইছি। মাইনষের হাতে মারা পড়ল মন্তাজ। হারিসুল মরণের লগে লড়ত্যাছে। আন্নেরা জনপ্রতিনিধি। জনগণের খবর রাখতে পাল্লেন না। পাল্লে এমনডা অইত না। আমি আমার দায়িত্ব পালন কচ্ছি, পোলাপাইনগোরে মানুষ করণের লইগ্যা এইসব কচ্ছি। তাগোরে মানুষ করনের দায়িত্ব আমার। এই যে দেখত্যাছেন, এইডা চুরি না। এইডা দায়িত্ব। হ্যাগো চোহে চুরি অইতেই পারে। হেরলই পিডাইয়্যা বাইন্ধা রাখছে। বান্ধা পড়ছি কেনো জানেন? চুরির কৌশলডা বালা জানা নাই বইল্যা। জানলে ধরা পত্তাম না, সাজা পাইতাম না। অহন ইজ্জতের কতা আইয়ে না। আইয়ে দক্ষ হওনের কতা। বুঝতে পাচ্ছি দক্ষ না অইলেও ধরা পততে অইব। মাইরও খাইতে অইব। মততে অইব। অহন এইডা আমার চোহে চুরি না। পোলাপাইনগো খাওন আর লেহাপড়া করানোর লইগ্যা চাকরি। টেআর কাম। এইডা না করলে পোলাপানগো প্যাডে খাওন জুটব না। পোলাপাইনগোরে যহন পৃতিবীতে আনছি, তহন দায়িত্ব আছে। আমি সংসারের নেতা ও পিতা। দায়িত্ব অনেক। ঘরের মাইনষের সামনে ঠিকঠাক খাওন দেওয়া। আর পাপ কল্লে পাশ্চিত্ত করণ লাগবই। আগে করনই বালা।

চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল! দাদন আলী কথা বলতে পারছে না। হারিসুলের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ দিয়ে পানি ছাড়ে সে।

পুলিশের সামনে হাত বাড়িয়ে দেয় চেয়ারম্যান। অন্যায় আসলে দাদন আলী করে না। করেছি আমি। নেতা জনগণকে যেভাবে রাখে, জনগণ সেভাবেই থাকে। আমি ব্যর্থ চেয়ারম্যান। এই চোরদের নেতা। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করুন!♦

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্প

মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় রয়েছে। তিনি একাধারে ভাষাবিদ, গবেষক ও প্রাচ্যের অন্যতম সেরা দার্শনিক। মূলত তিনি আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। ফলে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এ মানুষটির গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড নিয়েই সাহিত্যমহলে আলোচনা হয়েছে বেশি। কিন্তু তিনি যে গল্পের পথে হেঁটেছেন, একটি গল্পের বইও আছে তাঁর 'রকমারি' নামে—সে বিষয়টি ওইভাবে আলোচনায় আসেনি। এর কারণ কোনো লেখকের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজকে গ্রাস করে ফেলে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্পের বেলাতেও তেমনি হয়েছে। যার কারণে গল্পকার মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে খুব কম সংখ্যক সচেতন পাঠকই জেনেছেন। এটা ঠিক যে তিনি আমাদের উল্লেখযোগ্য গল্পকার নন, কিন্তু বাংলা ভাষা, সমাজ ও সাহিত্যের নিবিড় পর্যবেক্ষক হিসেবে গল্পে তাঁর সমাজ অবলোকন ও গন্তব্যকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্পগুলো পাঠ করে এমনটাই মনে হয়েছে।

একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা গল্প 'বেহেশ্‌তের পত্র'। এ গল্পটি পড়ে মনে হয়েছে ছোটগল্পে নিবিষ্ট থাকলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কাছে আমরা আরো ভালো কিছু লেখা পেতাম। 'বেহেশ্‌তের পত্র' পাঞ্জাবি পাঠান রহীম বখ্‌শ ও তার শিশু কন্যার গল্প। পেশায় সৈনিক রহীম তিন মাসের ছুটি পেয়ে বাড়িতে আসে। তার ছয় বছরের মেয়ে বাবাকে পেয়ে হাতছাড়া করতে চায় না। সে সারাক্ষণ বাবার সঙ্গ চায়। হঠাৎ রহীমের ছুটি বাতিল হয়, কিন্তু কন্যা তাকে যেতে দিতে চায় না। এই দৃশ্যটি গল্পকার বর্ণনার মাধ্যমে দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্প থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে : 'আজ আবার বাপ কেন যাইবে—রহীম মেয়েকে বুঝাইতে পারিল না। সে কতবার সম্মুখ যুদ্ধে সঙ্গীনের খোঁচায় শত্রুকে হটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ মেয়ের মুঠা হইতে সে তাহার আঙ্গুল টানিয়া লইতে পারিল না। সে আজ হার মানিয়াছে। লড়াইয়ে সে কতবার শত্রুর লাইন ভেদ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কখনও সে যুদ্ধে বুদ্ধিহারা হয় নাই। এখন কিন্তু সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার

মাথাটা আজ বড়ই গুলাইয়া যাইতেছিল।' রহীম বখ্‌শ সেবার যুদ্ধে গেল কিন্তু আর ফিরলো না। বেঁচে থাকতে সে কন্যাকে চিঠি লিখতো। মৃত্যুর খবর রহীমের স্ত্রী মেয়েকে দেয়নি। ফলে কন্যাটি প্রতিদিনই পোস্টঅফিসে গিয়ে পিতার চিঠির খোঁজ করে। কিন্তু তাকে কঠিন বাস্তবতার কারণেই হতাশ হতে হয়। মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মা নিজেই রহীম বখ্‌শের নামে চিঠি লিখে। মেয়ে সে চিঠি পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়। চিঠিতে লেখা ছিল রহীম বেহেশতে আছে। সে ভালো আছে। আর এটাই তার শেষ চিঠি। তার জন্যে কন্যা যেন চিন্তা না করে! চিঠির কথা মা মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেও অবুঝ শিশুর সেটি বোধগম্য হয়নি। সে মাকে বলল, "আম্মাজান, আব্বাজানকে আসিতে বল, আমি আর রাগ করিয়া থাকিব না।" গল্পটি পাঠে পাঠককে শোকে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। রহীম বখ্‌শের ছ বছরের কন্যাটির করুণ মুখ, পিতার প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃশ্যময়তার কারণে গল্পের কন্যা শিশুটির জন্যে পাঠকের তীব্র ভালোবাসা তৈরি হয়। গল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্য ও দৃশ্যময় করে দেখা পাঠকের কম প্রাপ্তি নয়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বিলাত-ফেরত' গল্পটি নানা কারণে বিশেষত্বের দাবিদার। এ গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং স্ববিরোধীও। দীর্ঘ গল্পটিতে ব্যক্তি টানাপোড়েন, বিত্তের মোহ, ধর্ম ও ধর্মান্ধতা, প্রবাস-যাপনের প্রভাব উঠে এসেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র আবদুল মজীদের বাবা জমিদার খোন্দকার সমীরুদ্দীন সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেন। তাই তিনি একই সাথে কংগ্রেসে চাঁদা দেন, রাজপুরুষদের জন্যে পার্টিও দেন; উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি গ্রামে জুনিয়র মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই যে স্বার্থগত দ্বৈরথ, তা সত্ত্বেও তিনি চান ছেলে আবদুল মজীদ ধর্মপ্রাণ হোক। শৈশব থেকে বাবার কড়া ধর্মীয় শাসনের মধ্যে মজীদ বড় হয়। গল্পে মজীদ চরিত্রের বিকাশ ঘটে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার পর। সে জাহাজের ওঠার দ্বিতীয় দিনেই দীর্ঘদিনের রাখা দাড়ি, আচকান পায়াজামা আর তুর্কি টুপি বিসর্জন দেয়। নতুন চেহারার মজীদ বিলেত পৌঁছে আমূল বদলে যায়। গল্পে পিতার মৃত্যুর পর মজীদ বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়ির সবকিছু সাহেবী ঢংয়ে বদলে দেয় সে। 'সবুজ সমাজ' নামে সভা করে মজীদ ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু সবশেষে তার মুখে এক, মনে আরেক এবং সব কার্যক্রমই ফাঁপা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। গল্পের শেষদিকে মজীদ প্রকাণ্ড জমিদারি প্রাপ্তির লোভে বিয়ের পিড়িতে বসে। যদিও বিয়ে হওয়ার আগেই পাঠককে চমকে দিয়ে এক বিলেতি মেম বিয়ের আসরে হাজির হন। মেমের কথাসূত্রে পাঠক জানতে পারে, মজীদ বিলেতে

খ্রিস্টান হয়েছে। এই মেমই তার স্ত্রী। মেম মজীদকে টেনে গাড়িতে তুলে উধাও হওয়ার মধ্য দিয়ে গল্প শেষ হয়।

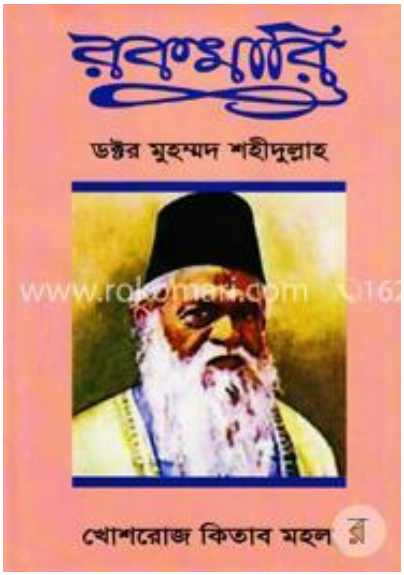

'বিলাত-ফেরত' গল্পটির বিপরীত একটি গল্প লক্ষ্মীছাড়া'। এ গল্পে ধর্ম নিয়ে স্বার্থের খেলা কিংবা মারপ্যাঁচ নেই। আছে ধর্ম ও মনুষত্ব্যের অপার উপস্থাপন। মানুষের সেবা করাই যে স্রষ্টাকে ভালোবাসার প্রকাশ সেটি 'লক্ষ্মীছাড়া'য় উঠে এসেছে। তালুকদারের বেখালি সন্তান রমযান স্ত্রী, সম্পদ সবকিছু হারিয়ে ফকির হতে চায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে আবদুল্লাহ নামে এক পীরের কাছে মুরিদ হতে যায়। পীর তাকে বলেন, যে আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসেনি, সে আল্লাহকে কেমন করে ভালোবাসবে? পীরের কথামত রমযান সৃষ্টির সেবায় বেরিয়ে পড়ে। সে একটি কুষ্ঠ আশ্রমে রোগীদের সেবা করে। শেষে নিজেও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। পীরসাহেব হজ্ব করতে যাওয়ার সময় গোয়ালন্দে রমযানের দেখা পান। রমযান তার প্রিয় পীরের কাছেই মৃত্যুবরণ করে। পীরের অন্যসঙ্গীরা হজ্ব করতে গেলেও পীর যাননি। গল্পের শেষে তিনি বলেন, 'লোকের দিল খুশী কর। এই হজ্জে আক্‌বর।' প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে লেখক গল্পের মাঝে মাঝে শেখ সাদীর শ্লোক ব্যবহার করেছেন। ফলে গল্পটি আরো স্পর্শনীয় হয়ে উঠেছে। সমাজ সচেতন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বিলাত-ফেরত' ও 'লক্ষ্মীছাড়া' গল্প দুটির মাধ্যমে ধর্মকে উপজীব্য করে সমাজস্থ মানুষের ভালো ও মন্দ—দুটি চিত্রই তুলে ধরেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহুভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের ভাষাপ্রীতি তিনি গল্পেও ব্যবহার করেছেন। ফার্সি থেকে অনুবাদ করেছেন 'নষ্টচন্দ্র' গল্পটি। তাঁর 'লা পারিযিয়েন' গল্পে প্যারিস ও ফরাসি ভাষাপ্রীতির সাক্ষর আমরা দেখি। যদিও গল্পটি মূলত প্রেমের। গল্পে মেধাবী ছাত্র রশীদ বিয়ের একবছর পর স্ত্রী সালেহাকে রেখে উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেতে যায়। অক্সফোর্ডে ভর্তি শেষে পড়াশোনাই হয়ে উঠে তার মূল কাজ। অবসরে সে দেশ থেকে আসা স্ত্রী-স্বজনদের চিঠি পড়ে, চিঠির উত্তর দেয়। সাথে সাথে চলে ফরাসি ভাষা চর্চা। বন্ধুদের অনুরোধে গ্রীষ্মের বন্ধে রশীদ প্যারিসে বেড়াতে যায়। সেখানে সুয্যান নামে এক কিশোরীর সাথে তার পরিচয় হয়। কিশোরী ভারতবর্ষকে ভালোবাসে। রশীদের কাছে ইংরেজি শিখতে চায়। বিনিময়ে সে রশীদকে ফরাসি শেখাবে। এ পর্যন্ত গল্পটি একরৈখিক চললেও প্যারিসে আসার পর গল্পে নতুন বাঁক উপস্থাপন করেন লেখক। রশীদ-সুয্যানের সম্পর্ক একসময় প্রেমে রূপ নেয়। এই মুহূর্তের প্রেম এতই তীব্র হয় যে, রশীদ দেশে থাকা স্ত্রী সালেহাকে তালাক দিয়ে সুয্যানকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুয্যানই সরে দাঁড়ায় রশীদের পথ থেকে। এরপর ফরাসী শেখারও ইতি টানে রশীদ। এ গল্পের শুরু স্বদেশে এবং শেষ বিলেতে। সবকিছুর বাইরেও আলোচ্য গল্পে লেখক কয়েকটি বাক্যে সচেতনভাবেই তৎকালীন সমাজচিত্র, যুবকদের উচ্চাশা, অপরিণামদর্শী প্রেম, অবদমন তুলে ধরেছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্পের শরীরে কখনো কখনো কাব্যিকতাও চোখে পড়ে। কিছু কিছু বাক্য যেন কবিতা কিংবা কবিতারই মত দর্শনঋদ্ধ। "আধ ভেজান জানালার পাশে রোজই বসি। আর রোজই দেখি নীচের গলি দিয়ে কত

লোকজন, কত গাড়ী অবিরাম যায়। সেখানে বসি কেন? না ব'সে কোথায় যাব?" 'বহুরূপী' গল্পটি শুরু হয়েছে এমন কাব্যিক বাক্যের মধ্য দিয়ে। আবার রম্যরসের গল্পও লিখেছেন শহীদুল্লাহ। 'গেরস্থের বৌ' গল্পে এক গেরস্থ মরুদেশের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মরুদেশে স্বাভাবিকভাবেই ছিল পানির অনটন। বিয়ের পর ভিনদেশের গেরস্থের বাড়িতে এসে মেয়েটি প্রথমবার নদী দেখে অবাক হয়। এত জল কীভাবে এল, সব জল মানুষ নিয়ে যাবে না তো— এমন চিন্তায় বউটি অস্থির হয়ে ওঠে। একদিন গেরস্থ বাড়ি ফিরে আবিষ্কার করলো, পুরো বাড়ি জুড়েই কেবল জলের কলসি আর জালা। বউটি ভেবেছিল, নদীর সব জল ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই জল জমা করা যাক! পুরো গল্পটিকেই সংক্ষিপ্ত ও সরস ভাষায় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

কোনো কোনো গল্পে কবিতার ব্যবহারও করেছেন গল্পকার। গল্পের চরিত্রগুলোও বৈচিত্র্যময়। স্কুলের হেড মৌলভী, পাঞ্জাবি পাঠান, পীর, মরুদেশের মেয়ে, গেরস্থ, জমিদার, মেম, খলিফা, পাগল, উকিল, পত্রিকার সহকারী সম্পাদকসহ নানা মানুষের গল্প মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন তাঁর ঢংয়ে। 'রসবতী' গল্পটিকে লেখকের গল্প পরিবেশনের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রসবতী'র গল্পকথকের চরিত্রটি শহীদুল্লাহ নিজেই। সেকারণেই হয়তো পত্রিকার সহকারী সম্পাদক গল্প চাইলে গল্পকথক বলেন, 'আমার কলমে তেমন গল্প জমে না।

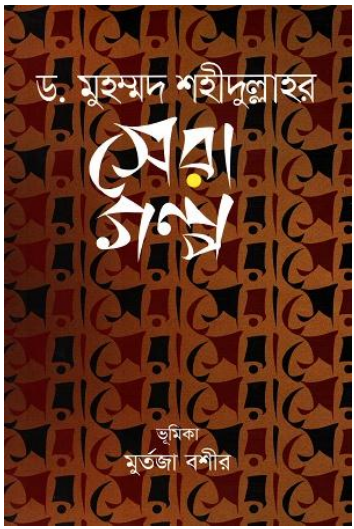

একটী ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আছে, যদি সেটা চান—'। সহকারী সম্পাদক লেখকের কাছে লেখা চাইতে এসেছেন। লেখক পুরানো ফাইল থেকে

গল্প বের করে পড়তে শুরু করলেন। সহকারী সম্পাদক গল্প বলার শুরুতেই ব্যাঘাত করেন। তিনি গল্পকথককে থামিয়ে বলেন, গল্পের চরিত্র পাঁচু নামটির পরিবর্তে সুকুমার বা বিমল রাখলে ভালো হয়। এরপর গল্পকার পাঁচুর রসগোল্লা চুরি, বন্ধু নরেনের সেই রসগোল্লা ভক্ষণ, ধরা পড়ে যাওয়া এবং প্রধান শিক্ষকের হাতে নরেনের বেত্রাঘাত খাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ করেন। কিন্তু গল্পটি সম্পাদকের ভালো লাগেনি। তিনি জানান, গল্পে দু ছোকড়ার রসগোল্লা নিয়ে কাড়াকাড়ির পরিবর্তে যদি 'গোপালের ষোল বছরের সুন্দরী রসিকা মেয়ে নিয়ে' কাড়াকাড়ি হলে গল্পটি জমতো। তিনি গল্পকারকে কাটাকুটি করে গল্পটি সংশোধনের অনুরোধ জানান। পরে গল্পকারের কথামতো নিজেই ইচ্ছামত পরিবর্তন করে গল্পটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই গল্পটির প্লট যে সাদামাটা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গল্পের ভেতরে যে আরেকটি গল্পের অবতারণা করেছেন, সেটি বিশেষত্বের দাবি রাখে। পাশাপাশি গল্পের মাধ্যমে সহকারী সম্পাদকের চরিত্রটিও পাঠকের কাছে ফুটে উঠেছে। ওইসময় এমন সম্পাদক চরিত্র থাকা অসম্ভব নয়। খুবসম্ভব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর কাছে পত্রিকার জন্যে লেখা চাইতে আসা সম্পাদকের এমন কোনো ঘটনাকে 'রসবতী' গল্পে রূপ দিয়েছেন।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সেরা গল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর সন্তান বরেণ্য চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর লিখেছেন, 'গল্পগুলোতে তাঁর যাপিত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, দেখা না দেখার জগতের ছায়া গল্পের শরীরে এসে পড়েছে। তবে এসব গল্পে তৎকালীন সমাজ, সমাজ বাস্তবতা, রাজনীতি, অবদমিত জীবনের নানা উত্থান-পতনের আখ্যান বেশ মোটা দাগে উঠে এসেছে।' মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্পগুলো পাঠ শেষে মুর্তজা বশীরের পর্যবেক্ষণ যথার্থই মনে হয়েছে। লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি ভাষাবিদ, গবেষক ও দার্শনিকের আড়ালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গল্পগুলো অনালোকিত রয়ে গেছে। তাঁর গল্পগুলো তৎকালীন সমাজ, যাপন, মানুষের চিন্তা-চেতনা, বৈষম্য, সংস্কারের কথা বলে। পাশাপাশি গল্পের ভেতরে পরোক্ষভাবে গল্পকারের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণও পাঠকের চোখে পড়বে। এ সবকিছু মিলিয়েই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে নতুনরূপে আবিষ্কারের জন্যে পাঠক তাঁর গল্পগুলো পাঠ করবেন— এই প্রত্যাশা রইলো।♦

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চিলিয়ান কবি

পাবলো নেরুদার কবিতা

গাজী সাইফুল ইসলাম

পাবলো নেরুদার (Publo Neruda) আসল নাম নেফতালি রিকার্ডো রিয়েস বাসোয়ালতো, জন্মগ্রহণ করেন ১২ জুলাই ১৯০৪, চিলির একটি শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন রেল কর্মচারি, আর মা, যিনি তাঁর জন্মের খুব অল্প সময় পরেই মারা যান, একজন শিক্ষিকা। কিছুদিন পর তাঁর বাবা ওখান থেকে টেমোকো শহরে চলে যান এবং আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করেন, যাঁর নাম Doña Malverde. কবি তাঁর শৈশব ও যৌবনকাল টেমোকোতেই কাটান। ওখানেই তিনি লাতিন আমেরিকার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৪৫) কবি গেব্রিয়েল মিস্ত্রালের নাম শুনেন। সেকেন্ডারি গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা গেব্রিয়েল মিস্ত্রালে প্রথম সাক্ষাতেই নেরুদাকে পছন্দ করেছিলেন।

তেরো বছর বয়স থেকেই নেরুদা স্থানীয় দৈনিক "La Mañana"-এ কিছু কিছু আর্টিক্যাল লিখতে শুরু করেন। ওই সময়ের লেখাগুলোর মধ্যে তাঁর প্রথম প্রকাশনা এবং কবিতা ছিল Entusiasmoy Perseverancia. ১৯২০ সালে তিনি সাহিত্য ম্যাগাজিন সেলভা অস্ত্রাল-এর কন্ট্রিবিউটর নিযুক্ত হন এবং পাবলো নেরুদা ছদ্ম নামে লিখতে থাকেন। এ নামটি তিনি গ্রহণ করেন চেকোশ্লাভ কবি জ্যান নেরুদার (১৮৩৪-১৮৯১) স্মৃতি হিসেবে। ওই সময়ের কিছু কবিতা নিয়ে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ক্রিসপাসকুলারিও এবং পরের বছর টুয়েন্টি লাভ পয়মস এন্ড ওয়ান সং অব ডেসপেয়ার। আর ওই দুটি কাব্যগ্রন্থের সুবাদেই কবি হিসেবে তিনি পরিচিতি পেয়ে যান চিলির সাহিত্যামোদীদের কাছে। এরপরই তিনি চলে যান চিলির সান্তিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেন্স এবং পেড্যাগোগি পড়ার জন্য।

স্কুল জীবনের একটি সাহিত্য পুরস্কার এবং সাহিত্যামোদীদের কাছে সামান্য পরিচিতিকে সম্বল করে নেরুদা পা বাড়িয়েছিলেন পৃথিবীর পথে, এ ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়েছিল তাঁর চাকরি অর্থাৎ ডিপ্লোম্যাটিকের পদটি। তখন চিলির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁরই বন্ধু সালভাদর আলেন্দে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত চিলির প্রথম প্রেসিডেন্ট। নেরুদাকে যখন কতকগুলো অপরিচিত দেশের নামের একটি তালিকা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো–কোথায় যেতে চান আপনি, তিনি বললেন 'রেঙ্গুন'।

১৯২৭ সালে তিনি এশিয়ার (বার্মার) উদ্দেশ্যে চিলি ত্যাগ করেন এবং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন কনসোলেট হিসেবে। এরপর সিলোন, জাভা, সিঙ্গাপুর, বুয়েন্স আয়ারেস, বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে আরও তিন বছর কাটান। ওই জটিল সময়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলো নিয়ে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয় রেসিডেন্স অন আর্থ'-এর প্রথম খণ্ডটি। পরে সিরিজ আকারে ১৯৩৫ সালে 'রেসিডেন্স অন আর্থ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯২২ সালে প্রকাশিত পেরুভিয়ান কবি সিজার ভ্যালেজোর 'ট্রিলস' এবং ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত নেরুদার 'রেসিডেন্স অন আর্থ' চিহ্নিত হয়ে আছে ওই সময়ের লাতিন আমেরিকান অ্যাভগাড আন্দোলনের সেরা স্মারক হিসেবে। প্রত্যক্ষকরণে নতুনত্ব ছাড়াও ওই সময়কার তাঁর কবিতার ভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল বিপ্লবী চেতনা। এটা ঠিক ইউরোপিয়ান ধারার আঁভাগ্রাদ আন্দোলনের মতো নয় যেখানে চিত্রশিল্পে যথেচ্ছা প্রতীকের ব্যবহার কিংবা ইউরোপীয় আধুনিকতার কথা বলা হয়, যেখানে প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয়ের এবং প্রযুক্তিগত অর্জনের প্রশংসা করা হয়। অ্যাভগাড আন্দোলনের ভাবধারার সঙ্গে আধুনিকতার আন্তঃসম্পর্ক গড়ে দিয়ে নেরুদা মানুষের চেতনাকে অনেকাংশে

শাণিত করে তুলেছিলেন। এছাড়াও তিনি লাতিন আমেরিকার কাব্য সাহিত্যে গড়ে তুলেছিলেন একটি জনপ্রিয় লোকজ ধারা।

নেরুদার বেশ খ্যাতি রয়েছে স্পেনিশ গৃহযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৬-১৯৩৯) ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে তিনি খনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার পক্ষে অবস্থান নিয়ে তাদের তিনি গঞ্জালেস ভিদেলার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে চিলির রাজনীতিতে সরাসরি সক্রিয় হয়ে তিনি সালভাদর আলেন্দের প্রেসিডেন্টসিয়েল নির্বাচনের প্রচারণায় অংশ নেন। ওই সময় ভক্তরা তাঁর প্রেমের কবিতা এবং রাজনৈতিক কবিতার পক্ষ নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আসলে ওই ধরনের বিভাজনের কোনো অর্থ ছিল না, কারণ, কবিতাসহ নেরুদার অন্যান্য লেখা ততদিনে গণমানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল। তিনি পরিণত হয়েছিলেন গণমানুষের কবিতে।

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে আধুনিকতার আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ ধরা হয় পাবলো নেরুদাকে। তাঁর সময়ে লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে যে নতুন একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল সেটি রাজনৈতিক স্বাধীনতার আলোকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বাস্তবতার নতুন নতুন ব্যাখ্যা দান করেছিল।

নেরুদার থার্ড রেসিডেন্স (১৯৩৭)-এ একটি কবিতা ছিল, 'স্পেন ইন মাই হার্ট' গৃহযুদ্ধের সময় লিখা। 'আই এম এক্সপ্রেসিং অ্যা থিং' কবিতায় তিনি ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝাড়েন এভাবে–

"এক সকালের বহ্নুৎসবের
আগুন
লাফিয়ে এলো পৃথিবীতে
ঘিরে ধরল সব মানুষকে
তারপর সেই আগুনে
যোগ হলো গান পাউডার
এবং তারপর রক্ত।
...
প্রতিটি বাড়ি পুড়ল শস্যকণার বদলে
বাতাসে উড়ল ধাতব গন্ধ
...
এবং তখনই তুমি জিজ্ঞেস করলে
কেন নয় তাঁর কবিতা
যেখানে স্বপ্ন আর পাতাদের কথা

এবং তাঁর দেশের আগ্নেয়গিরির কথা?
এসো এবং দেখে যাও পথের ওপর কেমন
রক্ত ছড়ানো।"...

নেরুদার কিছু কিছু কবিতা এত শক্তিশালী যে, লোকেরা তখন যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতায় এগুলো ব্যবহার করত। রচনা-কৌশল এবং উপস্থাপিত বিষয়ের জন্য তাঁর পাঠকরাও বদলে গিয়েছিল। তাঁর জন্যই কবিতা আর ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য হয়ে রইল না, হয়ে গেল সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। স্টানফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সমালোচক জেন ফ্রাংকো বলেছেন, 'তাঁর কবিতা শুধু বিনোদন মূলক পাণ্ডুলিপি নয় অথবা নয় পত্রিকায় ছাপা কিছু অক্ষরের সমষ্টি, তাঁর কবিতা অলঙ্কারপূর্ণ এমন শব্দমালা যাতে মানবাত্মার অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা সোচ্চার হয়ে উঠে।' আর নিজের কবিতা মূল্যায়ন তিনি এভাবে করেছেন, 'আমার কবিতা শ্রমিক আর সাধারণ মানুষের জন্য লেখা আমার আবেগেরই পরিণতি। এগুলো কোনো নীতি কথা নয় অথবা নয় কোনো মতবাদের প্রতি প্রতিশ্রুত থেকে আউরে যাওয়া। আমি সর্বদা সচেতন রয়েছি লাতিন আমেরিকা সামাজিক নিয়মাকানুনের প্রতি যেমন সচেতন রয়েছি পৃথিবীর অন্যান্য উপাদান ফুল, সাগর এবং জীবন সম্পর্কে।'

১৯৩৬-এ নেরুদা প্যারিসে যান এবং ১৯৩৭-এ মাদ্রিদে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন করেন। এরপর শিঘ্রই তিনি চিলিতে ফিরলেন যখন দেখলেন, সমগ্র লাতিন আমেরিকা জুড়ে ফ্যাসস্টিদের সমর্থক জুটে গেছে। এই বাস্তবতা নেরুদার কবিতায় সংযোজন করে দিল একটি নতুন স্বর, অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে ও ন্যায়বিচারের দাবীতে সংগ্রামরত মানুষদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা ঘোষণা করলেন। ১৯৩৯ সালে নেরুদা সংক্ষিপ্ত সফরে আবার প্যারিসে যান, স্পেনের সেইসব বুদ্ধিজীবীদের উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিতে, যারা চিলির উদ্বাস্তু শিবিরে আটকা পড়েছিল। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে আগত রিফিউঝিদের অবস্থা দেখে তিনি এত আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর কাব্য দর্শনে যুক্ত হলো দৃঢ় নতুন প্রতিশ্রুতি।

ডিপ্লোম্যাটিক হিসেবে নেরুদা শেষ দায়িত্ব পালন করেন মেক্সিকোয়। সেটা ১৯৪০-এর দশকের শুরুতে। সেইসময় তিনি মেক্সিকোর ম্যুরালিস্ট এবং পেইন্টারদের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ পান। সেই সময় তিনি তাঁর সেন্টো জেনারেল (১৯৫০)-এর কাজ শুরু করেন। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম মহাকাব্যের ভাবধারায় রচিত হলো একটি কাব্যগ্রন্থ। নেরুদা বুঝতে পেরেছিলেন, পেরুর 'Macchu Picchu'-র আইকান ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনের পর তাঁর সামনে আরেক বাস্তবতার দুয়ার খুলে গিয়েছে। তিনি

লিখেছেন, 'নিজেকে তখন আমার কখনো একজন চিলিবাসী, কখনো একজন আমেরিকান, কখনো একজন পেরুবাসী মনে হয়েছিল। একই সঙ্গে এমন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমার মনে হচ্ছিল, সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যাঁরা নিজেদের নিঃশেষ করে দিয়েছেন এবং গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সঙ্গে আমিও একাত্ম হয়ে গেছি। আমার উচিত তাঁদের জন্যই সততার সঙ্গে আমার লেখা চালিয়ে যাওয়া।'

আর্জেন্টিনার সমালোচক সোল উরকিয়েভিচ বলেন, 'দু'টি কাব্যিক ধারণার চূড়ান্ত পরিণতি নেরুদার সেন্টো জেনারেল।'

ভেনিজুয়েলার পত্রিকা El Nacional যখন নেরুদাকে তাদের পত্রিকায় লেখার জন্য আহ্বান জানাল, নেরুদা তাদের উত্তর দিলেন, আমার কবিতা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত হয় মূল পত্রিকায়। পরে ওই পত্রিকায় তিনি প্রথম যে কবিতা লিখেন, তাহলো, 'Ode to the Bread'

"যখন তাকাই
রুটির দিকে, এর
গঠনশৈলী দেখি না আমি।
রুটি পছন্দ করি
তাই কামড় দিই তাতে
এবং এর পরেই
দেখতে পাই গম,
গমের নতুন ক্ষেত
বসন্তের সবুজ উচ্ছাস
মূল
পানি
ইত্যাদি সব।
রুটির বাইরে যখন
তাকাই, দেখি
ভূমি
পানি
মানুষ
এবং এভাবেই প্রতিটি বস্তুর স্বাদ নিই আমি।
এরপর সবকিছুতে
কেবল তোমাকে খুঁজি।"...

এরপর ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় নেরুদার ক্যাপটেইন'স ভার্স। তখন থেকেই রাজনীতি তাঁর কবিতার অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হলো। ক্যাপটেইন'স ভার্স-এ কিছু প্রেমের কবিতাও ছিল। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী Matilde Urrutia-কে। কিন্তু এ সব কবিতা মোটেই তাঁর পূর্বের কবিতার মতো নয়। পূর্বের কবিতায় যেমন অপরিচিত রহস্যময়ী নারীর রহস্য উন্মোচনের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এসব কবিতায় এমন ধারণার দেখা মিলল না। এখানে তিনি পরিচিত নারীর সঙ্গ লাভ করেছেন খুব কাছে থেকে। প্রতিদিনের জীবনের আনুসঙ্গিক উপাদান, যেগুলো একান্তই প্রকৃতি থেকে পাওয়া, যেমন ভুট্টা, গম, কন্দ ও পাতা ইত্যাদি নিয়ে তিনি উৎযাপন করেছেন প্রিয়ার সান্নিধ্য এবং সঙ্গিনীর সর্বসময়ের সংগ্রামকে করেছেন উপজীব্য। একই বছর সম্পূর্ণ ভিন্নরকম কিছু কবিতা নিয়ে তাঁর 'ফুলি এমপাওয়ারড' নামের আরেকটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল।

১৯৪৫ সালে চিলির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর নেরুদা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য স্পেনিশ সিভিল ওয়ারের (১৯৩৬-৩৯) সময় তাঁর ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনই তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় করেছে। আবার, চিলির ডিক্টেটর গঞ্জালেস ভিদেলার (১৯৪৫-১৯৫০) বিরুদ্ধে খনি শ্রমিকদের আন্দোলনে তাঁর কবিতা হয়েছিল লাকড়ির চুলায় ঘি সংযোগের সামিল।

রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে ফাঁসোয়া ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালে সামরিক আগ্রাসন শুরু হলে গৃহযুদ্ধের আগুন চারপাশে ছড়িয়ে গেল। সে সময় ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে আন্দোলনে নেরুদার অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত বীরোচিত। এ কারণে সম্মানজনক কসসোলার পদ থেকে চিলির কর্তৃপক্ষ তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ গ্রহণের দায়ে তাঁর কবি বন্ধু গার্সিয়া লোরকাকে সরকারের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডারা ছুরিকাঘাত করলে কবি লোরকা মারা যান। ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে পুলিশ সে সময় রাফায়েল আলবার্তির বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিল। 'স্পেন ইন মাই হার্ট (১৯৩৬)' কাব্যগ্রন্থে নেরুদার ওই ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এসব কবিতার দ্বারা কবি নেরুদা নিজেও বদলে গিয়েছিলেন।

তাঁর কবিতার প্রথম সংগ্রহটি ছাপা হয়েছিল এক ভয়াবহ বিরূপ পরিস্থিতিতে। বন্দুকের মহুর্মুহু গর্জনের মধ্যে রিপাবলিকান সৈনিকেরা আগে ছাপার কাজ শিখল, এরপর, পুরনো একটি ছাপাখানায় তাঁর কবিতার বই ছাপল। তারা বই ছাপানোর সকল কাজ সম্পন্ন করেছিল একজন সৈনিকের রক্তাক্ত জামা দিয়ে বানানো শত্রুদের একটি ফ্ল্যাগ কারখানার ওপর টানিয়ে নিয়ে। বইটি

কিভাবে ছাপা হয়েছিল এ ব্যাপারে নেরুদা স্মৃতিচারণ এ রকম, 'সত্যি ওইসব লোকদের প্রশংসা করতে হয় যারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও সেদিন আমার বইটি প্রকাশ করেছিল। সেদিন অনেক সৈনিকই খাদ্য ও বস্ত্র কেনার টাকা থেকে অর্থ বাঁচিয়ে আমার একটি কবিতার বই কিনে নিয়েছিল।' যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে স্পেনিশ উদ্বাস্তুরা যখন ফ্রান্সে পৌঁছল অবশিষ্ট বইগুলো তারা বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

এরপর শিগগিরই নেরুদা চিলিতে ফিরলেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যে, তিনি তাঁর দেশের মানুষের ভাগ্য বদলের উদ্দেশ্যে অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। কমিউনিস্টদের সমর্থন নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ভিদেলার সরকার ১৯৪৫ সালে ক্ষমতায় এসেছিল, নেরুদার কারণেই চাপের মুখে পড়ল ভূখা-নাঙা খনি শ্রমিক আর শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাত্রার মানন্নোয়নে ভূমিকা রাখার জন্য। কিন্তু সামন্তবাদী একচেটিয়া বর্জোয়া আর আমেরিকান করপোরেশন যেমন চিলি এক্সপ্লোরেশন কো., দি অ্যানাকুন্ডা কুপার এবং অ্যাংলো চিলিয়ান নাইট্রেট, এক কথায় চিলির খনি শিল্প যাদের পুরো নিয়ন্ত্রণে ছিল, শ্রমিকদের সুবিধাদানের ব্যাপারটা বেশিদিন সহ্য করল না। তারা কৌশল অবলম্বন করে চিলির সরকারকেই হেনস্থা করার জন্য। এ অবস্থায় উভয় সংকটে পড়ে ভিদেলা সরকার কমিউনিস্টদেরই সাইডলাইন না দিয়ে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমন্ত্রণ জানাল যুদ্ধকালীন আলোচনায় বসার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিলি যুক্তরাষ্ট্রকেই সমর্থন দিলো তার অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য। শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে না পেরে ভিদেলা আমেরিকার কৃপা লাভের আশায় খনিসমৃদ্ধ উঁচু ভূমিগুলো বিক্রি করে দিলো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে। আর তাতে আমেরিকানরা শিকারি কুকুরের মতো কমিউনিস্টদের ওপর নজরদারী শুরু করল। ফলে চিলির অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্ভিক্ষের রূপ নিয়ে পত্রিকার শিরোনাম হলো। অর্থের অভাবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেয়া বন্ধ হয়ে গেল, মুদ্রার মূল্য পড়তে লাগল আর মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে লাগল লাফিয়ে।

ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা আরও শোচনীয় আকার নিল। 'লুটা' ও 'কুরনেল'-এ খনি শ্রমিকদের দুরাবস্থা তাদের বাধ্য করল সাধারণ ধর্মঘটে যেতে। এ পরিস্থিতিতে পতিত খনিশ্রমিকদের দুর্দশা নেরুদা তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন। 'শরীর হিম করা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সমুদ্রের নিচ দিয়ে বয়ে চলা আট কিলোমিটার ধরে খনি-কড়িডোরে কাজ করার কষ্ট অন্যদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।' প্রেসিডেন্ট ভিদেলা ধর্মঘট বানচাল করে দিল, প্রত্যাখ্যান করল শ্রমিকদের বিরূপ কর্মক্ষেত্র ও জীবন যাত্রার নিম্নমান সংক্রান্ত সকল দাবী-দাওয়া। উপরন্তু শ্রমিকদের সে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসকারী আখ্যায়িত করে তাদের

ওপর এমন নিপীড়ন চালালো যাকে কেবল নাজি কন্সেট্রেশন ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিদ্রোহ দমনে সে সেনাবাহিনী নামালো এবং চরম স্বৈরাচারি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের ওপর নজিরবিহীন অত্যাচার চালাল। সেনা আর পুলিশ বাহিনীর যৌথ দল পুরো এলাকা ঘিরে হাজার হাজার শ্রমিক এবং তাদের পরিবার আটক করে চিলিয়ান টেরিটরি বাইরে দুটি কনসেন্ট্রশন ক্যাম্প 'সানতা মারিয়া' এবং 'পিসাগুয়া'য় তাদের নির্বাসনে পাঠাল। 'পিসাগুয়া'য় শ্রমিকদের সঙ্গে জায়গা দিলো বুদ্ধিজীবী আর রাজনৈতিক নেতাদেরও। আজেন্টিনা থেকে পুলিশ আনা হলো ধর্মঘটকারীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর জন্য। ওইসব দিনগুলোতে সংবাদপত্রসহ সকল প্রচার যন্ত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, বাক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ সন্ত্রাস কবলিত হয়ে পড়েছিল যে, সেখানে মুক্তভাবে নিঃশ্বাস টানাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কোনো প্রকার কারণ বা অভিযোগ ছাড়াই লোকদের ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র বাধতামূলকভাবে সরকারে বানোয়াট উন্নয়ন কাহিনী আর অন্যান্য ঘোষণার প্রচারণা চলতে লাগল। এ অবস্থাতেও নেরুদা খনি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সরে গেলেন না, তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষায় ভিলেদার সমালোচনা করতে লাগলেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর, তিনি ভেনেজুয়েলার প্রভাবশালী দৈনিক 'El Nacional'-এ ভিদেলার সমালোচনা করে 'I Accuse' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিনেটে নেরুদার কসোলেট পদটি স্থগিত করে দেয়া হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে, ১৯৪৮ সালে নেরুদা গোপনে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং দু'বছর নির্বাসনে কাটান।

১৯৬৯ সালে যখন নেরুদাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলা হলে প্রথমে তিনি রাজি হলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, কমিউনিটি প্রার্থী হিসেবে জনপ্রিয় সালভাদর অ্যালেন্দের আবির্ভাবে তিনি তাঁর প্রার্থী হওয়ার চিন্তা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিলেন। চিলিয়ান জনগণের বিজয়ের আশায়, তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়ার আশায় তিনি অ্যায়েন্দের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরাসরি অংশগ্রহণ করলেন। অ্যালেন্দে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে ১৯৭০-এ নেরুদা চিলির অ্যাম্বাসেডর হয়ে ফ্রান্সে যান। কিন্তু অসুস্থতার কারণে ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নেরুদা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লিখে গেছেন। মানুষ আজও তাঁকে স্মরণ করে তাঁর শক্তিশালী কবিতার জন্য, নির্যাতন আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের জন্য এবং চিলির মানুষদের কণ্ঠে ভাষা তুলে দেয়ার জন্য। তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'জীবনের শিক্ষা আমি পেয়েছি মানুষের ভিড় থেকে। সে শিক্ষা নিয়েই বেরিয়ে আসতে পেরেছি, জন্ম হয়েছে ভীরু এক কবির। কিন্তু

ভীরু ভয় নিয়েই একদিন চলে এলাম সবার মাঝে। তখন মনে হলো, ধন্য হয়ে গেছি; প্রয়োজনীয় সর্বাধিক সংখ্যক জনতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেছি আমি। মহান মনুষ্য বৃক্ষের শাখায় সংযোজিত হলো আরও একটি পাতা।

১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টম্বর জেনারেল পিনোশে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সালভাদার অ্যালেন্দেকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করল। আগেই বলা হয়েছে সালভাদর আলেন্দে ছিলেন নেরুদার বন্ধু এবং চিলির প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। অ্যালেন্দের মৃত্যুর ন'দিন আগে এবং তাঁর 'স্মৃতিকথা'র শেষ অধ্যায় লেখা শুরু করার ৭২ ঘণ্টা পরে ২৩ সেপ্টম্বর, ১৯৭৩ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন নেরুদা। এই 'স্মৃতিকথা'য় তিনি জেনারেল পিনোশের কর্মকাণ্ডকে চিলির জনগণের বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর দেশ এবং বন্ধু অ্যালেন্দের বিরুদ্ধে যে অবিচার সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবত এই ভাবনায়ই তিনি খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল মিলিটারি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক বিক্ষোভ পালনের মধ্য দিয়ে।

পাবলো নেরুদার কবিতা

সবচেয়ে বেদনার কথাগুলো আজরাতে আমি লিখতে পারি

সবচেয়ে বেদনার কথাগুলো আজরাতে আমি লিখতে পারি ।

লিখতে পারি, যেমন, রাত গভীর হচ্ছে
আর দূরে বসে নীল নক্ষত্ররা ছাড়ছে দীর্ঘনিঃশ্বাস।

রাতের বাতাস আকাশে বিচরণ করে আর গান গায়।

সবচেয়ে বেদনার কথাগুলো আজরাতে আমি লিখতে পারি ।
তাকে ভালোবাসতাম, মাঝেমধ্যে সেও বাসতো আমাকে।

এমনই কোনো এক রাতে, আমি বাহুপাশে বেঁধেছিলাম তাকে
চুমু খেয়েছিলাম বার বার–সীমাহীন আকাশের নিচে।

মাঝেমধ্যে সে ভালোবাসতো আমায় এবং আমিও তাকে।
এমন সুন্দর চোখ যার, তাকে ভালো না বেসে কে পারে।

সবচেয়ে বেদনার কথাগুলো আজরাতে আমি লিখতে পারি ।
পাবো না তাকে ভাবলেই মনে হয়-হারিয়ে ফেলেছি তাকে।

কৌতূহলোদ্দীপক এই রাতে এখনও শুনি তার সুর, তাকে ছাড়া

হৃদয়ে ঝরে কবিতা পশুচারণভূমিতে শিশির ঝরার মতো ।

কী এসে যায় তাতে, আমার ভালোবাসা ধরে রাখতে পারেনি তাকে
রাত গভীর হচ্ছে আর সেও নেই আমার সঙ্গে।

এসবই আরকি। দূরে কেউ একজন গান গাইছে, দূরে।
তাকে হারিয়ে ফেলে সন্তুষ্ট নয়–আমার মন।

আমার দৃষ্টি তাকে খুঁজছে যেন বা যাবে তার সঙ্গে
আমার হৃদয়ও তাকে খুঁজছে কিন্তু সে নেই আমার সঙ্গে।

রাত রয়েছে একইরকম তুষারশুভ্র গাছগুলোও
আমরা, নেই আর এখনও সেই সময়ের মতো।

বেশিদিন আর ভালোবাসা হবে না তাকে, নিশ্চিয়ই, অনেক ভালো বেসেছি
আমার শব্দমালা খুঁজে ফিরেছে বাতাস যা স্পর্শ করতে পারে তার শ্রবণিন্দ্রিয়।

অপরের, সে হয়ে যাবে অপরের, আগের সেইসব চুমুগুলোর মতো আমার
তার কণ্ঠস্বর, উজ্জ্বল শরীর, অসম্ভব মায়াবি চোখ।

বেশিদিন আর ভালোবাসা হবে না তাকে, নিশ্চিয়ই, অনেক ভালো বেসেছি
ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী না ভোলার বেদনা দীর্ঘস্থায়ী।

কারণ এমন একটি রাত জুড়ে আমি রেখেছিলাম তাকে বাহুলগ্না করে
তাকে হারিয়ে ফেলে সন্তুষ্ট নয়–আমার মন।

যদিও এটা কষ্টের কারণ যে সে আমাকে ভোগিয়েছে
এবং শেষ এই কবিতা লিখলাম তাকে স্মরণ করে।

যদি আমায় ভুলে যাও

আমি জানাতে চাই তোমাকে
একটা বিষয়।
তুমি জানো কী সেটা :
যদি আমি তাকাই
স্বচ্ছ চাঁদের দিকে, সিঁদুররঙ শাখার দিকে
আমার জানালায় ধীরে বহমান শরতের দিকে,
যদি আমি স্পর্শ করি
আগুনের বুকে

স্পর্শাতীত ছাই
অথবা জীর্ণ গাছের গোড়া,
প্রতিটি বস্তুই আমাকে নিয়ে যায় তোমার কাছে,
যেন বা অস্তিত্বমান প্রতিটি বস্তু,
সৌরভ, আলো, ধাতু
হয়ে যায় ছোট্ট নৌকা
এরপর পাল তুলে
তোমার সেইসব দ্বীপের দিকে–যারা থাকে আমার অপেক্ষায়।
আর এখন,
যদি একটু একটু করে তুমি বন্ধ করো আমাকে ভালোবাসা
আমিও একটু একটু করে ভুলে যাব তোমায়।
যদি সত্যিই
ভুলে যেতে পারো, যেও
ভেবো না আমার কথা,
কারণ ইতোমধ্যেই আমিও ভুলে যাবো তোমাকে।
যদি মনে করো এটা ক্লান্তিকর, স্রেফ পাগলামি
ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব
বয়ে যাবে আমার ওপর দিয়ে,
এবং যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো
তীরচ্যুৎ করবে আমায়,
সেই হৃদয়ের তীর–যেখানে শিখড় আমার,
মনে রেখো যে,
ওই দিনের
ওই সময়,
আমিও ওপরে তুলব আমার হাত
এবং শিকড়গুলো আমার
খুঁজে নেবে অন্যকোনো ভূমি।
কিন্তু
যদি প্রতিটি দিনের,
প্রতিটি মুহূর্ত
তুমি অনুভব করো তোমার গন্তব্য আমার দিকে
অপ্রতিরোধ্য টান,
যদি প্রতিটি মুহূর্তে ফুটে একটি করে ফুল

তোমার অধরে আর খুঁজে আমাকে।
আহ্ আমার ভালোবাসা, আহ্ কত না আপন তুমি
আমার ভেতরে জ্বালিয়ে রেখেছ আগুন, সবসময়।
আমার ভেতরে নেই কিছু চাপা পড়া কিংবা ভুলে যাওয়া
আমার ভালোবাসা বাঁচেই তোমার ভালোবাসা পেয়ে, প্রিয়তমা
যতদিন বেঁচে থাকো তোমার হাত দু'টি যেন
ছেড়ে না যায় আমাকে।

তোমার হাসি

রুটি সরিয়ে নাও আমার সামনে থেকে, যদি ইচ্ছে হয়,
বাতাসও বন্ধ করে দাও, কিন্তু
তোমার হাসি থেকে বঞ্চিত করো না আমায়।
সরিয়ে নিও না গোলাপ,
তাজা ফুল, যা তুমি কুড়িয়েছ
সহসা ছড়িয়ে যায় যে পানি আনন্দ উদযাপনে
রূপালি যে তরঙ্গ হঠাৎ
ভেসে উঠে তোমার মননে।
আমার পরিশ্রম কঠোর এবং আমি ফিরে আসি
চোখের পলকে,
প্রথম দেখার সেই দিন থেকে
পৃথিবী রয়েছে অপরিবর্তিত,
কিন্তু যখন তোমার হাসি প্রবেশ করেছে
আকাশে গেছে ওঠে আমাকে খোঁজার জন্য
এবং ওটি খুলে দিয়েছে আমার সামনে
জীবনের সকল দরজা।
প্রিয়তমা আমার, গহন অন্ধকারে তোমার হাসি
ছড়ায় আলো, যদি হঠাৎ দেখো আমার রক্তে
রঞ্জিত হচ্ছে রাস্তার পাথরগুলো
তখনও তুমি হেসো, কারণ তোমার হাসি
ঠিক অব্যবহৃত তলোয়ারের মতো।
এরপর শরতে, সাগরের বুকে শোনা যাবে
তোমার হাসি, তার ফেনিল তরঙ্গে,
এবং বসন্তেও, প্রিয়তমা,
কামনা করব তেমার হাসি সেই ফুলের মতো

যার জন্য আমি অপেক্ষা করে ছিলাম,
পেছনে থেকে নিরন্তর ডেকে যাওয়া
আমার দেশের নীলরঙ সেইসব ফুল আর গোলাপ।
হাসি রাতে
দিনে, দুপুরে
হাসি মোড়যুক্ত রাস্তায় দ্বীপদেশের
হাসি পাগলাটে ছেলেটির প্রতি যে তোমাকে ভালোবাসে,
কিন্তু যখন আমি খুলি আমার চোখ
এবং বন্ধ করি
যখন আমি সামনে হাঁটি
এবং পেছনে রাখি পা
দিও না রুটি, বাতাস, আলো, বসন্তকাল
কিন্তু বঞ্চিত করো না তোমার হাসি থেকে
তাহলে বাঁচব না আমি।

প্রশ্ন

ভালোবাসা, একটি প্রশ্ন
ধ্বংস করেছে তোমাকে।
আমি ফিরে এসেছি তোমার কাছে
কণ্টকাকীর্ণ অনিশ্চয়তা থেকে।
অথচ কিনা আমি চেয়েছিলাম তোমাকে
তরবারীর অথবা সড়কের মতো সোজা।
কিন্তু তুমি জিদ্ ধরেছিলে, কোনো ছায়াচ্ছন্নতায়
নির্জন জীবন যাপনের জন্য– যা আমি চাইনি।
প্রিয়তম আমার,
বুঝতে চেষ্টা করো আামায়,
চোখ থেকে পা অবধি, পায়ের নোখ
ভেতরে,
সবরকম ঔজ্জ্বল্য, যা তুমি ধরে রেখেছিলে।
এই হলাম আমি, প্রিয়তমা আমার
টুকা দিচ্ছি তোমার দুয়ারে।
কোনো ভূত কিংবা নই সেই লোক
যে একদা দাঁড়িয়েছিল তোমার জানালায়,
জানালা টপকে আমি পৌঁছলাম তোমার কাছে

এবং প্রবেশ করলাম তোমার জীবনে,
আর বাসা বাঁধলাম তোমার মনে
তুমিও ফেরালে না।
তুমি অবশ্যই খুলবে প্রতিটি বন্ধ দরজা
তোমার মনে আর মন থেকে
মেনে নেবে আমাকে।
তুমি অবশ্যই মেলে ধরবে তোমার চোখ,
যেখানে আমি খুঁজব নিজেকে আমার
তুমি অবশ্যই দেখবে আমায় হাঁটি কীভাবে
ভারি পদক্ষেপে– একটানা দীর্ঘসড়কে
অন্ধ অপেক্ষায় থাকবে তুমি।
ভয় পেয়ো না,
আমি তোমার।
কিন্তু
আমি নই যাত্রি কিংবা ভিক্ষুক,
আমি প্রভু তোমার,
যার জন্য তুমিও অপেক্ষায় ছিলে।
এবং আমি যে প্রবেশ করেছিলাম
তোমার জীবনে,
এ সত্য কোনোদিন বাদ দেয়ার নয়,
ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসাই
থেকে যাবে।

হতাশার গান

তুমি ভোগ করো সবকিছু দূরত্ব
সমুদ্র, কাল
সবকিছু হারায় তোমার মাঝে।
ওটা ছিল জড়িয়ে ধরা আর ভালোবাসার সুখী সময়।
সম্মোহনের সময়, যা বাতিঘরের মতো ছড়াচ্ছে আলো
নাবিকের আতঙ্ক, অন্ধ সাঁতারুর ক্রোধ
ভালোবাসার শরাব পানে টালমাটাল,
সবকিছু ডুবে তোমার মাঝে। ♦

বজ্রপাতে নিরাপত্তা বিষয়ক উপায়সমূহ

মো. উবাইদুল্লাহ

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে বজ্রপাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্ষা মৌসুমে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত বেশি হয়। বিকট শব্দের এসব বজ্রপাতে মারা যায় অনেক মানুষ। বৃষ্টি হলেই বজ্রপাতে মানুষ মৃত্যুর খবর সংবাদ মাধ্যম গুলোতে প্রচার হচ্ছে। এতে মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে। যার ওপর বজ্রপাত হয় তার মৃত্যু অনেকটাই নিশ্চিত। বিষয়টি সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলছে। বাংলাদেশের বজ্রপাত নিয়ে এক গবেষক দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণায় দাবি করেন দেশে সারা বছর ধরে যে পরিমাণে দুর্যোগ হয়, তার মধ্যে মে মাসে হয় সবচেয়ে বেশি। তবে মে মাস তো বটেই, সারা বছরের হিসাবে বজ্রপাতকে অন্য কোনো দুর্যোগ টপকে যেতে পারবে না। কারণ, ২০১৯-২০ সালের মধ্যে দেশে এক বজ্রপাতই হয়েছে ৩১ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি। এর ২৬ শতাংশের বেশি তৈরি হয় মে মাসে। অন্য এক পরিসংখ্যানে জানা যায় দেশে বছরে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়। এর মধ্যে এপ্রিল থেকে জুনে হয় ৭০ শতাংশ। ২০১৩-২০২০ (জুন পর্যন্ত) দেশে মোট ১ হাজার ৮৭৮ জন বজ্রপাতে মারা গেছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের ৭২ শতাংশ কৃষক।

পরিসংখ্যানটি আমলে নিয়ে যদি আমরা দেখি যে বজ্রপাতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের ৭২ শতাংশ কৃষক। যারা কিনা ক্ষেতে খামারে কাজ করে। এ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রক্ষা করতে হলো যা যা করা সম্ভব তা তা আমাদের করতে হবে। মনে রাখা দরকার বজ্রপাত হচ্ছে আসমানি দুর্যোগ। মহান আল্লাহ তায়ালার মহাশক্তির এক ছোট নিদর্শন। যদিও বজ্রপাত সংঘটন ঠেকানোর কোনো উপায় আমাদের জানা নেই। কেননা এর মূল কারণ দৈনন্দিন আবহাওয়া, যার নিয়ন্ত্রণ করেন মহান আল্লাহ। পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৮০ লাখ বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। উন্নত দেশগুলোতেও একসময় বজ্রপাতে বহু মানুষের মৃত্যু হতো। কিন্তু তারা বজ্রনিরোধক খুঁটি বা পোল স্থাপন করা, মানুষকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনেছে।

বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বজ্রপাতের ক্ষতিহ্রাসের জন্য কৌশল এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এ বজ্রপাতের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানকারী অবসারভেটরি সিস্টেমের শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বজ্রপাতের পূর্বাভাস প্রাপ্তির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ২২ লাখ তাল/খেজুর জাতীয় গাছ সারাদেশে রোপণ করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বজ্রপাত সংক্রান্ত বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এনজিও কর্তৃক সঠিক তথ্য সম্বলিত পোস্টার, লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে। বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির সৎকার এর জন্য এবং আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক

সহায়তা প্রদান, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি ও প্রদর্শন, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা প্রদর্শন, সচেতনতা মূলক গান তৈরি করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, মোবাইলে এসএমএস এবং সামাজিক মিডিয়ায় বজ্রপাতের পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া ইত্যাদি।

দেশে বজ্রপাত থেকে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসে স্থানীয় প্রশাসনকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক কৌশল গুরুত্বপূর্ণ। যেমন স্থানীয় প্রশাসন অতিরিক্ত বজ্রপাতপ্রবণ জেলাগুলোতে বজ্রপাত সংঘটনের সময় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। যেমন বিকেল থেকে সন্ধ্যার পর বজ্রপাতের সংখ্যা বেশি বলে জনগণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বজ্রপাতের নিরাপত্তা বিষয়ক উপায় সমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বিশেষ করে সরকারী প্রাথমকি বিদ্যালয়গুলোকে কাজে লাগানো হোক। কেন আর কি ভাবে? আর তা হলো গ্রামীণ জনপদের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারী প্রাথমকি বিদ্যালয়ের মতো আর কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান এভাবে সব গ্রামে গঞ্জে নেই। তা হলে এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে পড়ালেখা করছে লাখ-লাখ শিক্ষার্থী। তাদের পাঠ্য বইয়ে অর্থাৎ প্রাথমিকের পাঠ্যক্রমের মধ্যে যদি বজ্রঝড়ের সময় কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় ইত্যাদি সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলে ঐ সকল শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারে এ বজ্রঝড়ের করণীয় সম্পর্কে অবগত করাতে পারবে পাশাপাশি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। ফলে গণমানুষের অনেক কাছাকাছি বজ্রপাত এর সময় কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় বিষয়টি পৌঁছানো যাবে। কারণ নিজের সন্তানের কাছথেকে বজ্রপাতের বিষয়টি জানলে মানুষ বিষয়টিকে আরো বেশি গুরুত্ব দিবে। আমরা জানি বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য ১৮টি উপায় বলে

দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। ১৮টি উপায়ই প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ে বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ে বজ্রপাত শিরোনামে একটি অধ্যায় করা হোক। যেমনটি ভূমিকম্প শিরোনামে একটি অধ্যায় করা হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের মানুষের সৌভাগ্য যে এ বজ্রপাতের সব কটি শরীরে এসে আঘাত করে না। তাই যদি হতো, তাহলে কী হতো, তা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর সংবাদ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে যে আগের চেয়ে বজ্রপাতের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। গবেষকগণ ভূ-উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, বজ্রপাত আগের চেয়ে বাড়েনি। যদিও সরকার বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য তালগাছ লাগানোর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বলে জানা যায়। এ পরিস্থিতিতে সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। এ স্বীকৃতিতে বজ্রপাতের সংখ্যা কমবে বা বাড়বে না। তবে বিষয়টির গুরুত্ব জনগণের কাছে আরো তীব্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। তাই বজ্রপাতে মৃত্যু বা হতাহতের সংখ্যা কমাতে হলে আমাদের এ দুর্যোগের ধরন বুঝতে হবে। এটি কখন, কেন ও কীভাবে আমাদের ওপরে আঘাত হানে। জানতে হবে কীভাবে এ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

বর্ষা মৌসুমে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতবেশি হয়। বজ্রপাত মহান আল্লাহ তায়ালার মহাশক্তির এক ছোট নিদর্শন। এতেই মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে। যার ওপর বজ্রপাত হয় তার মৃত্যু অনেকটাই নিশ্চিত। মনে রাখা জরুরি বজ্রপাত হচ্ছে আসমানি দুর্যোগ। মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখার একটি সতর্কবার্তাও বটে। এ বজ্রপাত আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তার এক মহানিদর্শন। তিনি ইচ্ছা করলেই যে কাউকে এ বজ্রপাতের মাধ্যমে শাস্তি দিতে পারেন। আবার মানুষও এ বজ্রপাত থেকে সর্বোত্তম শিক্ষা নিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের একটি সূরার নাম রেখেছেন রা'দ। যার অর্থও বজ্রপাত। বজ্রপাত নামে নাজিল হওয়া সূরায় মহান আল্লাহ সে কথাই ঘোষণা করেছেন– 'তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য এবং আশার জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। তাঁর (তাহমিদ) প্রশংসা কর। বজ্র এবং ফেরেশতারাও তার ভয়ে (তাসবিহ রত)। তিনি বজ্রপাত করেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি তা (বজ্রপাত) দ্বারা আঘাত করেন। এরপরও তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।' (সূরা রা'দ : আয়াত ১২-১৩)'

এ কারণেই রাসূল (সা) তাঁর উম্মতকে আসমানি দুর্যোগ বজ্রপাত থেকে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছেন দোয়া। যারা এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাদের

বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে হেফাজত করবেন। হাদিসে এসেছে– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) যখন বজ্রের শব্দ শুনতেন বা বিদ্যুৎ চমক দেখতেন তখন সঙ্গে সঙ্গে বলতেন– (উচ্চারণ) *'আল্লাহুম্মা লা তাক্বতুলনা বিগাদাবিকা ওয়া লা তুহলিকনা বিআজাবিকা, ওয়া আ'ফিনা ক্বাবলা জালিকা।' (তিরমিজি)* **অর্থ :** 'হে আমাদের প্রভু! তোমার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমাদের মেরে ফেল না আর তোমার আজাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না। বরং এর আগেই আমাদের ক্ষমা ও নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে নাও।'

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে আসমানি দুর্যোগ বজ্রপাত থেকে মুক্ত থাকতে প্রিয় নবী (সা)-এর শেখানো দোয়া এবং তাসবিহ পড়ে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাওয়ার তাওফিক দান করুন।

যেহেতু বজ্রপাত একটি আসমানি দুর্যোগ এবং মানুষের তা প্রতিহত করার ক্ষমতা নাই। তাই যে মহান প্রভু আল্লাহ এই দুর্যোগ মানুষকে প্রদান করেছেন তাঁর কাছেই মহানবী (সা)-এর শিখানো পন্থায় আশ্রয় প্রার্থনা করার পাশাপশি বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবার প্রচেষ্ঠা করা উচিত। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যে ১৮টি উপায় বলে দিয়েছে তা সঠিক ভাবে প্রতিপালন করলে আশা করা যায় বজ্রপাত এর মতো দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যাবে। তার আগে আসুন বজ্রপাত সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নেয়া যাক।

বজ্রপাত কি?

বজ্রপাত হচ্ছে বিশালাকার বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণ যা মেঘ থেকে মেঘে অথবা মেঘ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে আঘাত করে। বজ্রপাতে গড় চার্জের পরিমাণ ৩ থেকে ৫ মিলিয়ন ভোল্ট এবং এর মধ্যে রয়েছে প্রতি ঘন্টায় ২২০ শত মাইল গতিসম্পন্ন ৩০ কিলো এম্পেয়ারস এর কারেন্ট।

বজ্রপাতের কারণ

বজ্রপাতের প্রাথমিক কারণ হচ্ছে দীর্ঘ শুষ্ক সময় শেষে আর্দ্রতা; বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে বাতাসের তাপমাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের তুলনায় কম থাকায় গরম বায়ু দ্রুত উপরে উঠে গেলে আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শ পায় তখন গরম বায়ু দ্রুত ঠাণ্ডা হওয়ায় বজ্রমেঘের সৃষ্টিতেই বজ্রপাত সংঘটিত হয়। আকাশে গভীর ও উলম্ব আকারের মেঘের উপস্থিতি বজ্রপাতের পূর্বাভাস বলে ধরে নেয়া হয়।

বিদ্যুৎ চমক দেখা এবং বজ্রপাতের শব্দ শোনার মধ্যবর্তী সময় দ্রুত হিসাব করার পদ্ধতি

* ৩ সেকেন্ড = আপনার অবস্থান থেকে ১ কি.মি. দূরে।
* ১০ সেকেন্ড = আপনার অবস্থান থেকে ৩ কি.মি. দূরে।

* শুধুমাত্র বজ্রপাত = সর্বোচ্চ ৪০ কি.মি.।
* বজ্রপাতের পরিধি = প্রায় ৩০ কি.মি.।

তিন ধরনের বজ্রপাত

গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৫-২০২০ সালে বাংলাদেশে তিন ধরনের বজ্রপাত সংঘটিত হয়। এক মেঘ থেকে আরেকটি মেঘে বা আন্তমেঘ, একই মেঘের এক স্থান থেকে আরেক স্থান বা অন্তমেঘ এবং মেঘ থেকে ভূমিতে। এ সময়ে ওই তিন ধরনের বজ্রপাতের মোট পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৫০ লাখ। এগুলোর দৈনিক ও ঋতুভিত্তিক সংঘটনে আবার ভিন্নতা দেখা গেছে। যেমন ২৪ ঘণ্টা হিসাবে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় রাত ৮-১০ টার মধ্যে, ১২ শতাংশ।

ঋতুভিত্তিক বিন্যাসেও বজ্রপাতের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। মার্চ থেকে মে মাসে প্রায় ৫৯ শতাংশ, আর মৌসুমি বায়ু আসার সময়, অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৩৬ শতাংশ বজ্রপাত হয়। তবে মোট বজ্রপাতের প্রায় ৭০ শতাংশ হয় এপ্রিল থেকে জুনে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশে আসার আগের দুই মাসে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে বজ্রপাতের প্রকোপ অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি হয়। বর্ষাকালে রাঙামাটি, সুনামগঞ্জ ও চট্টগ্রাম বজ্রপাত সংঘটনের দিক থেকে প্রথম তিনটি জেলা। শীতকালে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট আর মৌসুমি-উত্তর ঋতুতে রাঙামাটি, চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়।

অন্যদিকে দেশে শুধু মেঘ থেকে ভূমিতে সেপ্টেম্বর ২০১৫-২০২০ সংঘটিত বজ্রপাতের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২৭ লাখ ৮ হাজার ৩০৬টি। এর মধ্যে মে মাসে সর্বোচ্চ ২৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ, জুনে ১৭ দশমিক ২ শতাংশ, আর সেপ্টেম্বরে

১৫ দশমিক ৬২ শতাংশ বজ্রপাত হয়েছিল। দৈনিক সংঘটনের দিক থেকে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হয় ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ। আর মেঘ থেকে ভূমিতে আঘাত হানা বজ্রপাতের পরিমাণ মাত্র দুটি ঋতুতে সীমাবদ্ধ। এ দুই ঋতুতে সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, রাঙামাটি ও কুড়িগ্রামে সর্বাধিক বজ্রপাত হয়ে থাকে। শীতকালে পটুয়াখালী, বাগেরহাট আর খুলনায় বেশি সংখ্যক মেঘ থেকে ভূমিতে বজ্রপাত হয়। সুতরাং উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে বজ্রপাতের স্থানিক ও কালিক ধরন, বিশেষ করে মেঘ থেকে ভূমিতে সংঘটিত বজ্রপাতের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার।

বজ্রপাতের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৮০ লাখ বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। উন্নত দেশগুলোতেও একসময় বজ্রপাতে বহু মানুষের মৃত্যু হতো। কিন্তু তারা বজ্রনিরোধক খুঁটি বা পোল স্থাপন করা, মানুষকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনেছে। তবে তার আগে বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টি করেছে উন্নত দেশগুলো। এতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলোসহ পূর্ব এশিয়ায় বজ্রপাতে হতাহতের সংখ্যা বহুলাংশে কমেছে। যদিও বজ্রপাত সম্পর্কে অনেক কল্পকাহিনি প্রচলিত, বিজ্ঞানের কল্যাণে বজ্রপাতের কারণ পরিষ্কার হয়েছে। সহজ ভাষায় বায়ুমণ্ডলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জের গঠন ও পৃথকীকরণে বজ্রপাত সংঘটিত হয়। সারা বছরের হিসাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত সংঘটিত হয় ভেনেজুয়েলার মারাকাইবো হ্রদে। অন্যদিকে আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার অবস্থান দ্বিতীয়।

কীভাবে বজ্রপাত হয়

মেঘ থেকে ভূমিতে ধাবিত বজ্রপাত মানুষ ও সম্পদের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। মনে রাখা দরকার, বায়ুমণ্ডলে শক্তি বা এনার্জিও পুনর্বিন্যাসে ঝড় ও বজ্রপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এ ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ পৃথিবীর তাপ পরিস্থিতিকে একটি সুষম বা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখে। বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপ্তি অনেক এলাকা জুড়ে হয়, কিন্তু বজ্রপাত নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। আবার দিনের সব সময় বজ্রপাত হয় না, অর্থাৎ এটা সংঘটনের স্থান ও কাল জানলে হতাহতের সংখ্যা বহুলাংশে কমানো সম্ভব। উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে বজ্রপাতের স্থানিক ও কালিক ধরন, বিশেষ করে মেঘ থেকে ভূমিতে সংঘটিত বজ্রপাতের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার।

যদি কেউ খালি মাঠে বা পানির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সমতল ভূমির তুলনায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির উচ্চতা বেশি হওয়ায় সে সরাসরি বজ্রপাতের শিকার হতে পারে। এমন প্রাণহানিকে সরাসরি আঘাত বলা হয়। অন্যদিকে কেউ

যদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন মুঠোফোনে কথা বলে বা কম্পিউটারে কাজ করে অথবা টিনের ঘরে টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকে, তবে বজ্রপাত থেকে নির্গত অতিরিক্ত ভোল্টেজের সংস্পর্শে মৃত্যুবরণ করতে পারে। শস্য বপন বা আহরণের কাজে মানুষ মূলত দুই পা আড়াআড়ি করে সারিবদ্ধ অবস্থায় জমিতে কাজ করে। তাঁরা স্টেপ ভোল্টেজের কারণে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

গবেষণার তথ্যানুসারে ২০১৩-২০২০ (জুন পর্যন্ত) দেশে মোট ১ হাজার ৮৭৮ জন বজ্রপাতে মারা গেছেন। বজ্রপাতে দেশে বার্ষিক প্রাণহানির হার প্রতি ১০ লাখে ১ দশমিক ৬ জন। কিন্তু এপ্রিল-মে মাসে প্রতিদিন প্রায় দু'জন বজ্রঝড়ের কারণে মারা যায়। কারণ, মার্চ থেকে জুনে কৃষকেরা বোরো ধান রোপণ ও কাটার কাজে ব্যস্ত থাকেন। মাঠে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে কাজ করেন। ফলে তাঁরা বজ্রপাতের আঘাতের প্রথম শিকার হন। তাই কৃষিকাজ করার সময়ে কৃষকদের মৃত্যুর হার বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি, ৭০ শতাংশ। বাড়িতে ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যান ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ। আর গোসল, মাছ ধরা অবস্থায় মারা যান ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। অন্যদিকে মোট প্রাণহানির ২১ শতাংশ হয়ে থাকে ঘরের অভ্যন্তরে। অথচ একটু সচেতন হলেই বজ্রপাত থেকে মৃত্যু ঠেকানো যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে বজ্রপাতে বিপদাপন্ন পরিমাপের একটা জনপ্রিয় পদ্ধতির নাম ৩০-৩০ বা '৩০ সেকেন্ড ৩০ মিনিট'। ৩০ সেকেন্ড: বজ্রপাত দেখা ও শোনার সময় থেকে ৩০ সেকেন্ড গুনতে হবে। যদি দুটির মধ্যকার সময় ৩০ সেকেন্ডের কম হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে। অথবা আপনি যদি বজ্রঝড়ের শব্দ শুনতে পান, তবে নিরাপদ স্থানের সন্ধান করা সবচেয়ে নিরাপদ।

কেননা, বজ্রপাত সাধারণত ঝড়ের সময় বা পরপরই হয়ে থাকে। ৩০ মিনিট: বজ্রঝড়ের শেষ শব্দ শোনার পর থেকে ৩০ মিনিট নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে হবে। নয়তো বজ্রপাতে মৃত্যু বা জখমের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। তবে বজ্রপাতের ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য সচেতনতা বা সতর্কতা অত্যাবশ্যক।

বজ্রপাত থেকে বাঁচার ১৮ উপায়

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরে বজ্রপাতে মৃত্যু বেড়েই চলেছে। এটি থেকে বাঁচতে ১৮টি উপায় বলে দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে বলা হয়েছে, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে নিজে জানুন, অন্যকে জানান।

১. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন।

২. ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহির হবেন না; অতি জরুরি প্রয়োজনে রবারের জুতা পড়ে বাইরে বের হতে পারেন।

৩. বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না।

৪. বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন।

৫. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।

৬. উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

৭. কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।

৮. বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

৯. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।

১০. বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলো বন্ধ রাখুন।

১১. বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতল যুক্ত ছাতা ব্যবহার করবেন না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে পারবেন।

১২. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।

১৩. বজ্রপাতের সময় ছাউনি বিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাবেন না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

১৪. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।

১৫. প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

১৬. খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান।

১৭. কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান।

১৮. বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্র আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।♦

লেখক : সহকারী শিক্ষক, ভূইয়ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী।